মহাদেশ	দেশ	মুখ্য গম উৎপাদক অঞ্চল / রাজ্য	বাণিজ্যের প্রকৃতি
উত্তর আমেরিকা	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	প্রেইরি তৃণভূমি ও চারনোজেম মৃত্তিকা বলয়। লোহিত নদী (রেড রিভার) উপত্যকাকে "পৃথিবীর রুটির ঝুড়ি" বলে। উত্তর ও দক্ষিণ ডাকোটা, মন্টানা, মিনেসোটা প্রভৃতি রাজ্য।	রপ্তানিকারক দেশ।
	কানাডা	প্রেইরি তৃণভূমি; পিস নদী উপত্যকা; লরেন্সীয় নিম্নভূমি। ম্যানিটোবা, সাসকাচুয়ান, অ্যালবার্টা প্রভৃতি রাজ্য।	রপ্তানিকারক দেশ।
দক্ষিণ আমেরিকা	আর্জেন্টিনা	পম্পাস তৃণভূমি; গ্র্যান চাকো (Gran Chaco)।	রপ্তানিকারক দেশ।
	ব্রাজিল	দক্ষিণের পম্পাস তৃণভূমি।	আমদানিকারক দেশ।
	চিলি	বেকার নদী উপত্যকা; মধ্য চিলির সমভূমি।	আমদানিকারক দেশ।
আফ্রিকা	ইজিপ্ট	মধ্য ও নিম্ন নীলনদ উপত্যকা।	আমদানিকারক দেশ।
	দক্ষিণ আফ্রিকা	অরেঞ্জ ও ভাল্ নদী অববাহিকা।	আমদানিকারক দেশ।
	আলজিরিয়া	আটলাস পর্বতের দক্ষিণের তৃণভূমি।	আমদানিকারক দেশ।
	টিউনিসিয়া	ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলবর্তী সমভূমি।	আমদানিকারক দেশ।
ওশানিয়া	অস্ট্রেলিয়া	মারে-ডার্লিং নদী অববাহিকা; পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া উপকূল অঞ্চল।	রপ্তানিকারক দেশ।
	নিউজিল্যান্ড	উপকূলবর্তী সমভূমি।	আমদানিকারক দেশ।

সারণি ১২.৪ : গমের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য — ২০১২ (লক্ষ মেট্রিক টন)

আমদানি		রপ্তানি	
দেশ	পরিমাণ	দেশ	পরিমাণ
ইজিপ্ট	১১৫·০	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	২০০·০
ইউরোপীয় ইউনিয়ন	৫৮.০	ইউরোপীয় ইউনিয়ন	৩১৫·০
ব্রাজিল	৬৭·০	অস্ট্রেলিয়া	১৬০·০
জাপান	৫৭·০	রাশিয়া	২৩৫·০
নেদারল্যান্ড	৫২·৬	কাজাকস্তান	১৫০.০

[উৎস : faostat.fao.org]

১২.০২ ধান (Rice)

ধান, গ্রামিনি গোত্রভুক্ত উদ্ভিদ ও পৃথিবীর ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের প্রধান ফসল। ধানের বিজ্ঞানসম্মত নাম **ওরাইজা স্যাটাইভা** (*Oryza sativa* Linn.)। আফ্রিকার দেশগুলি ছাড়া বিশ্বের সর্বত্র ওরাইজা স্যাটাইভা প্রজাতির ধানের চাষ হয়। আফ্রিকা মহাদেশে ধানের প্রচলিত প্রজাতিটি **ওরাইজা গ্ল্যাবেরিমা** (*Oryza glaberima*) নামে পরিচিত। ধান উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু ও জীবিকাসত্তাভিত্তিক প্রগাঢ় কৃষিব্যবস্থার প্রধান ফসল।

০১ ধানের গুরুত্ব ও ব্যবহার (*Importance and Uses of Rice*)

ধান থেকে উৎপাদিত চাল পৃথিবীর প্রধান খাদ্যশস্য। বিশেষত, বিশ্বের ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে ভাত, রুটির চেয়ে বেশি পছন্দসই খাবার। শ্বেতসার বা স্টার্চ ও মদ্য উৎপাদনের জন্য ধান স্বীকৃত কাঁচামাল। ধানের

খড় পশুখাদ্য হিসেবে, ছত্রাক চাষের জন্য, মাদুর-বোর্ড ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য, হস্তশিল্পে ও চারুকলায় এমনকি, গ্রামাঞ্চলে ঘরের আচ্ছাদনের উপকরণরূপে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ধানের তুষ থেকে তেল সংগ্রহ করা যায় এবং এ-জাতীয় স্নেহপদার্থ সাবান ও সুগন্ধি প্রস্তুতের কাজে ব্যবহার করা হয়।

০২ ধানের শ্রেণিবিভাগ *(Classification of Rice)*

বীজধান বপন ও ফসল সংগ্রহের সময় অনুসারে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ধানকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যেমন—

(১) আউশ ধান ঃ আউশ হেমন্তকালীন ধান। আউশের বীজ মে-জুন মাসে বপন করা হয় এবং সেপ্টেম্বর- অক্টোবর মাসে ধান সংগ্রহের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। বারিনির্ভর ও সেচসেবিত দু'ধরনের জমিতেই আউশ ধান চাষ করা যায়। সাধারণত জলনিকাশি সুবিধাযুক্ত, দো-আঁশ বা বালিমাটি এবং উঁচু জমি, আউশ ধানের উপযোগী প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। আউশের হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন হার ১,২০০–১,২৫০ কেজি।

(২) আমন ধান ঃ আমন শীতকালীন ধান। আমনের বীজ জুন থেকে জুলাই মাসের মধ্যে বপন করা হয় এবং নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ফসল সংগ্রহের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। এঁটেল ও দো-আঁশ মাটিতে আমনের ফলন ভালো হয়। হেক্টর প্রতি আমনের গড় ফলন হার ৩,০০০–৩,৮০০ কেজি। নীচু, কর্দমাক্ত জমিতে আমন ধান ভালো জন্মায়। উঁচু জমিতে এই চাষের জন্য সেচ একান্ত প্রয়োজন। আমন ধান খরিফ চাষের প্রধান ফসল।

(৩) বোরো ধান ঃ বোরো শীত ও গ্রীষ্মকালীন ফসল। নভেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে রবি মরশুমে বোরোর বীজ বপন করা হয়। মার্চ থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে ফসল তোলা হয়। বোরো চাষে সেচ একান্ত প্রয়োজন। উৎপাদনের হার হেক্টর প্রতি গড়ে ২,০০০–২,২০০ কেজি। জুন-জুলাই মাসে খরিফ বোরোর জন্য বীজ বপন করে সেপ্টেম্বর- অক্টোবর মাসে ফসল কাটা হয়।

জমির অবস্থান হিসেবে ধানকে দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়, যেমন— (১) নিম্নভূমি বা জলাভূমির ধান (Low land or Swamp Paddy); (২) উচ্চভূমি বা পার্বত্য অঞ্চলের ধান (Upland or Hill paddy)।

(১) নিম্নভূমি বা জলাভূমির ধান ঃ নিম্নভূমি বা জলাভূমির ধান উৎপাদন ও চালের মান অনুসারে শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর মোট উৎপাদিত ধানের প্রায় ৯৫ শতাংশ নিম্নভূমির ধান।

(২) উচ্চভূমি বা পার্বত্য অঞ্চলের ধান ঃ উচ্চভূমির ধানের উৎপাদন ও চালের মান ভালো নয়। আঞ্চলিক চাহিদা মেটানোর জন্য এ-জাতীয় ধান চাষ করা হয়।

০৩ উচ্চফলনশীল জাতের ধান *(High-yielding Variety Rice)*

ধানের কয়েকটি উচ্চফলনশীল জাত হল, আই আর ২০, আই আর ২২, আই আর ৮, আই আর ৫, আই ই টি ৮২৬, পঙ্কজ, পদ্মা, পলমন ৫৭৯, পুসা ৩৩–৩০, সি আর ১২৬–৪২–১ ইত্যাদি।

০৪ কৃষিঋতুর ভিত্তিতে স্থানীয় এবং উচ্চফলনশীল জাতের ধান *(Agricultural Seasons vis-à-vis Local and High-yielding Variety Rice)*

ভারতীয় উপমহাদেশে জনপ্রিয় কয়েকটি স্থানীয় ও উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত হল—

(১) আউশ ধান ঃ রত্না, পদ্মা, আই আর ৮, আশকাটা, দুলার প্রভৃতি।

(২) আমন ধান ঃ পঙ্কজ, বাসমতি, রূপসাল, ইন্দ্রসাল, ভাসামানিক, মাসুরি, কুমারগোর ইত্যাদি।

(৩) বোরো ধান ঃ বোরো ১, চিন্সুরা, জয়া, লাঠিসাল প্রভৃতি।

০৫ ভৌগোলিক পরিবেশ (Geographical Conditions)

(১) **বৃষ্টিপাত :** ধান অতি আর্দ্র বা অতি শুষ্ক যে-কোনো আবহাওয়ায় চাষ করা যায়। তবে ধান জলজ উদ্ভিদ বলে স্বাভাবিক বাড়বৃদ্ধির জন্য পরিমাণ মতো জল প্রয়োজন।

ধানচাষের প্রাথমিক অবস্থায় প্রচুর বৃষ্টিপাত (মাসে ১০–১৫ সেমি) দরকার। সাধারণত ১৫০–২০০ সেমি বাৎসরিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল ধানচাষের উপযুক্ত। তবে ১০০ সেমির কম বৃষ্টিপাত হলে জলসেচের দরকার হয়। ধান সংগ্রহের সময় বৃষ্টিপাত ফসলের পক্ষে ক্ষতিকর।

যে-সমস্ত ধানের জাত অপেক্ষাকৃত শুকনো বা কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে ভালো জন্মায়, সেগুলি হল— আই আর ৮, আই ই টি ৮২৬, আই ই টি ১৪৪৪, আই ই টি ২৯১৪, পলমন ৫৭৯, পুসা ৩৩–৩০, কাবেরী, রত্না ইত্যাদি। এ ছাড়া, মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত অঞ্চলে আই ই টি ২২৩৩, আই ই টি ১৪৪৪, সি এন এম ২৫, সি আর ১২৬–৪২–১, পলমন ৫৭৯ জাতের ধান চাষ করা যায়।

(২) **উষ্ণতা :** উষ্ণ পরিবেশ ধানচাষের উপযোগী। তবে অত্যধিক উষ্ণতায় ধানের ফলন ব্যাহত হয়। বীজতলা তৈরির সময় থেকে চারা লাগানোর কাল পর্যন্ত গড়ে ১০°–২১° সে. ও শস্য সংগ্রহের বেলা ৩৫°–৩৭° সে. উষ্ণতা ধানচাষের অনুকূল।

(৩) **মৃত্তিকা :** উর্বর পলি মাটিতে ধানের ফলন ভালো হয়। এ ছাড়া, দো-আঁশ, এঁটেল, বেলেমাটি, ল্যাটেরাইট, তরাই ও পার্বত্য অঞ্চলের মাটিতেও ধান জন্মায়। সামান্য অম্লধর্মী বা অল্প ক্ষারধর্মী মাটিতে (P^H ৫–৮) ধান চাষ করা যায়। মাটির জলধারণ ক্ষমতা অনুসারে উৎপাদনের তারতম্য হয়।

(৪) **ভূমি :** পাহাড় থেকে সমভূমি — ধান সর্বত্র চাষ করা গেলেও সমতল ভূপ্রকৃতি ধানচাষের অনুকূল। এখানে লক্ষ করা যেতে পারে যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধান উৎপাদক অঞ্চলগুলি নদীগঠিত সমভূমি এবং ব-দ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত।

(৫) **শ্রমিক :** শ্রমপ্রধান (labour intensive) বা শ্রমনিবিড় কৃষির প্রধান ফসল হল ধান। বস্তুত, পৃথিবীর জনাকীর্ণ ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলির প্রাকৃতিক পরিবেশ ধানচাষের অনুকূল হওয়ায় এবং আর্থ-সামাজিক কারণে জনগণের এক বিশাল অংশ কৃষিনির্ভর বলে ধানচাষে প্রচুর সস্তা শ্রমিক নিযুক্ত হয়।

(৬) **পরিবহন ও বণ্টন :** উন্নত, দক্ষ ও নির্ভরশীল পরিবহন এবং বণ্টন ব্যবস্থার সুবাদে ধানকে আরও লাভজনক চাষে রূপান্তারিত করা যায়। উল্লেখ্য যে গ্রামাঞ্চলের রাস্তা-ঘাট আধুনিক পরিবহনের উপযোগী করে গড়ে তোলা না হলে কৃষক বিজ্ঞানসম্মত চাষের সবরকম সুফল থেকে বঞ্চিত হবে। কৃষি-উপকরণ সংগ্রহ করা ও ফসল বাজার-জাত করার জন্য উন্নত পরিবহন ও বণ্টন ব্যবস্থা প্রয়োজন।

০৬ ধান উৎপাদনকারী প্রধান অঞ্চলগুলির ভৌগোলিক বণ্টন (Geographical Distribution of Major Rice Producing Areas)

পৃথিবীর ধান উৎপাদনকারী প্রধান অঞ্চলগুলি মূলত ৫০° উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৪০° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় বলয়ে অবস্থিত। মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলের দেশগুলি ধান উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। এশিয়া মহাদেশে চিন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, কোরিয়া, মায়ানমার, ফিলিপিন্স, জাপান ইত্যাদি দেশ; ইউরোপে ইতালি, স্পেন, ফ্রান্স, গ্রিস, পোর্তুগাল; উত্তর আমেরিকায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, পানামা, কিউবা; দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রাজিল, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর; আফ্রিকায় মিশর, মাদাগাস্কার, নাইজিরিয়া ইত্যাদি ধান উৎপাদনে অগ্রণী দেশ (চিত্র ১২.৪)। পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান ধান উৎপাদক দেশে ২০১২ সালে উৎপাদিত ধানের হিসাব সারণি ১২.৫-এ দেওয়া হল।

সারণি ১২.৫ : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ধান উৎপাদন — ২০১৫

দেশ	উৎপাদন (কোটি মে. টন)	দেশ	উৎপাদন (কোটি মে. টন)
চিন	১৪·৩৮	থাইল্যান্ড	১·৯০
ভারত	১০·৩৪	মায়ানমার	১·৬৫
ইন্দোনেশিয়া	৪·৫৮	ফিলিপিন্‌স	১·১৭
বাংলাদেশ	৩·৫০	ব্রাজিল	০·৮৫
ভিয়েতনাম	২·৯৪	পৃথিবী (মোট)	৪৯.০১

[উৎস : faostat3. fao.org]

□ **ভারত :** ধান ভারতের প্রধান খাদ্যশস্য। দেশের প্রায় ৮° উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৩৪° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে ধান উৎপাদক অঞ্চলটি অবস্থিত। জম্মু ও কাশ্মীর প্রদেশের প্রায় ২,০০০ মিটার উচ্চতা থেকে কেরালায় সমুদ্রপৃষ্ঠের নীচে অবস্থিত কুট্টানাদ অঞ্চলে ধান জন্মায়। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে ভারত একটি বিশাল ধান উৎপাদক অঞ্চল। দেশের আর্দ্র ও শুষ্ক সেচসেবিত অঞ্চলে ধান চাষ করা হয়। কৃষির আঞ্চলিক পরিকাঠামোর উপর নির্ভর করে উচ্চফলনশীল ও সনাতন প্রজাতির ধান চাষ করা হয়ে থাকে। খরিফ ও রবি মরশুমের মধ্যে খরিফ মরশুমে দেশে ধানের চাষ সবচেয়ে বেশি। আউশ ও আমন ধানের চাষ খরিফের অন্তর্গত। ভারতে ধান জীবিকাসত্তাভিত্তিক, শ্রমপ্রগাঢ় কৃষির ফসল।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ[১]-এর মত অনুসারে, দেশের মোট আটটি অঞ্চলে ধান উৎপাদিত হয়। যেমন—

(১) **পশ্চিম হিমালয়ের আর্দ্র অঞ্চল :** হিমাচল প্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর, উত্তরাঞ্চলের গাড়োয়াল অঞ্চল ইত্যাদি (পার্বত্য ও তরাই মৃত্তিকা)।

(২) **গঙ্গা-শতদ্রুর শুষ্কপ্রায় নদীগঠিত সমভূমি :** পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ইত্যাদি (দো-আঁশ মাটি, বেলেমাটি, পলিমাটি, লাল-বেলেমাটি প্রভৃতি)।

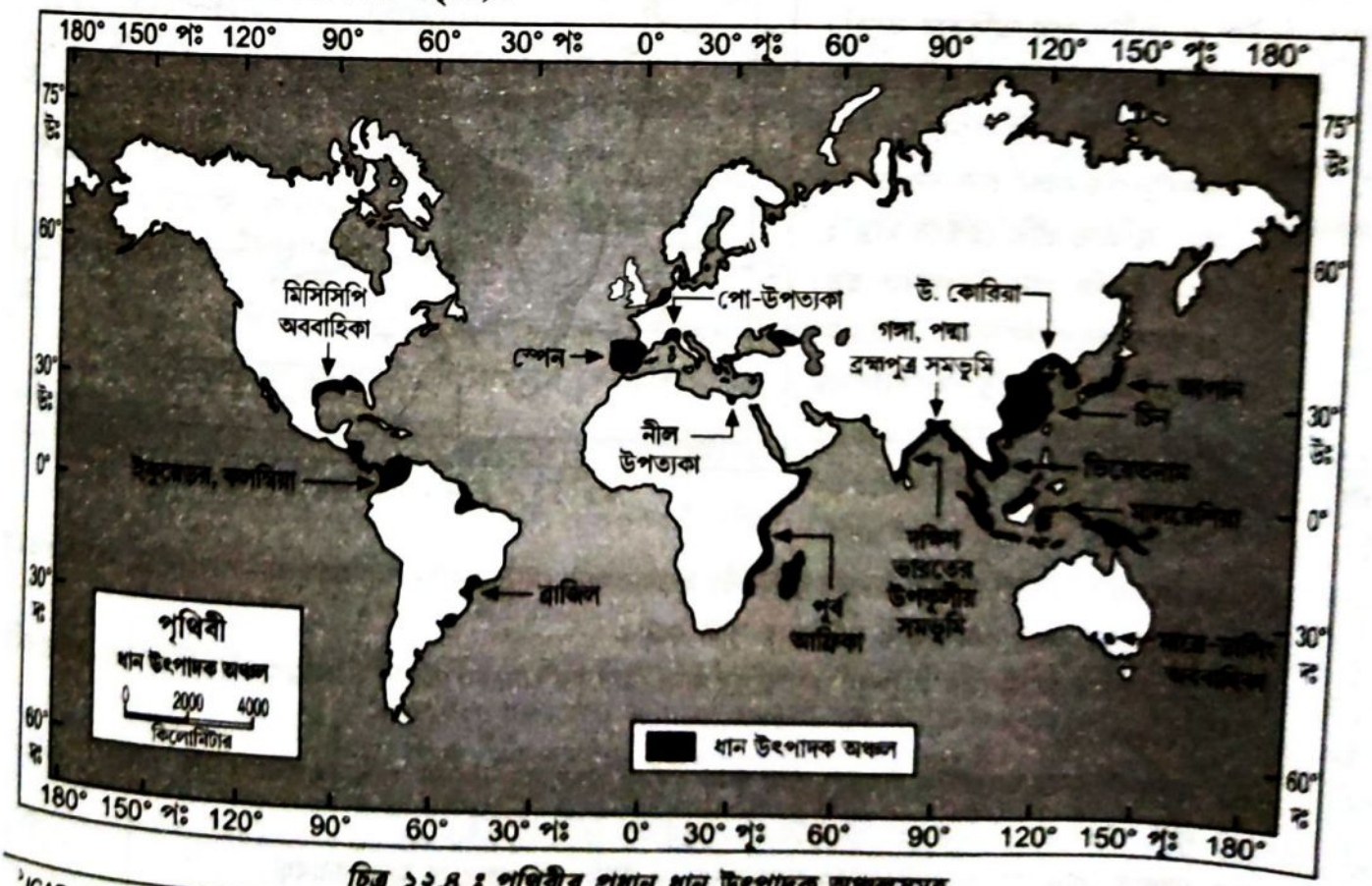

চিত্র ১২.৪ : পৃথিবীর প্রধান ধান উৎপাদক অঞ্চলসমূহ

[১] ICAR, 2008, Handbook of Agriculture

(৩) **পশ্চিম ভারতের শুষ্ক মরুপ্রায় অঞ্চল :** হরিয়ানা ও রাজস্থান (পলিমাটি, লাল-হলুদ মাটি ইত্যাদি)।

(৪) **পশ্চিমবঙ্গ-অসমের আর্দ্র, নদীগঠিত সমভূমি :** অসম ও পশ্চিমবঙ্গ (উর্বর নদীবাহিত পলিমাটি, লালমাটি, তরাই মৃত্তিকা, ল্যাটেরাইটিক মাটি ইত্যাদি) (চিত্র ১২.৫)।

(৫) **পূর্ব হিমালয়ের আর্দ্র অঞ্চল :** মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, ত্রিপুরা ইত্যাদি (লাল দো-আঁশ মাটি, ল্যাটেরাইটিক মাটি, পলিমাটি প্রভৃতি)।

(৬) **মধ্য ভারতের উচ্চভূমি :** মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ (কৃষ্ণমৃত্তিকা, লালমাটি, নদীবাহিত পলিমাটি ইত্যাদি)।

(৭) **দাক্ষিণাত্যের মালভূমি :** কর্নাটক, কেরালা, তামিলনাড়ু প্রভৃতি (কৃষ্ণমৃত্তিকা, লালমাটি, ল্যাটেরাইটিক মাটি, নদীবাহিত ও উপকূলবর্তী পলিমাটি)।

(৮) **পূর্ব-উপকূলবর্তী সমভূমি :** তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলঙ্গানা, ওড়িশা (নদীগঠিত ও উপকূল অঞ্চলের পলিমাটি, নোনা মাটি, দো-আঁশ মাটি ইত্যাদি)।

ভারত ধান উৎপাদনে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। তবে হেক্টর প্রতি ধানের উৎপাদন ভারতে অত্যন্ত কম যেখানে পৃথিবীর গড় উৎপাদন-হার প্রতি হেক্টরে ৩,৭৩০ কেজি। ভারতে ধান উৎপাদক রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ওড়িশা, তামিলনাড়ু, ত্রিপুরা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ইত্যাদি অন্যতম। পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ধান উৎপাদনে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে[১]।

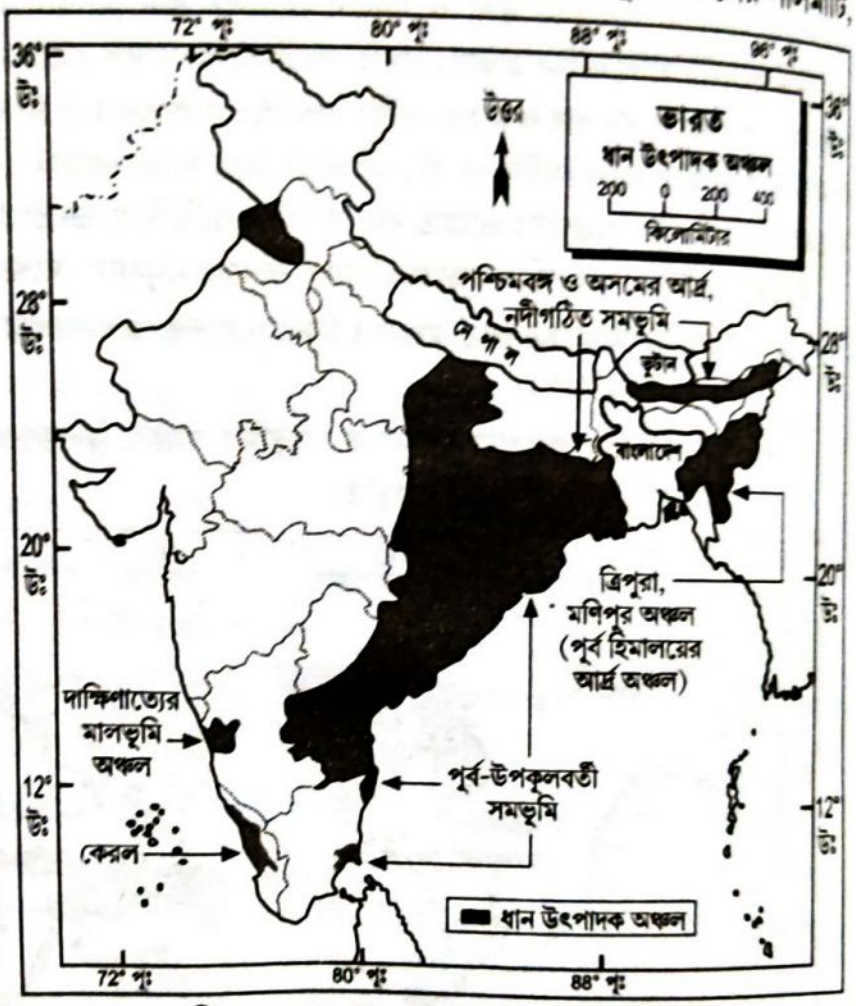

চিত্র ১২.৫ : ভারতের ধান উৎপাদক অঞ্চল

■ **ভারতে ধানচাষের সমস্যাগুলি হল :**

(১) ভারতে হেক্টর প্রতি ধানের উৎপাদন পৃথিবীর গড় ফলন-হার-এর তুলনায় কম। ভারতে প্রতি হেক্টরে মাত্র ২,০৫১ কেজি ধান উৎপাদিত হয়। যেখানে পুয়ের্তোরিকো, ইউক্রেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়ায় প্রতি হেক্টরে, যথাক্রমে ৮,৩৩৩ কেজি, ৭,৪৪৪ কেজি, ৬,৮৬০ কেজি ও ৬,৭৮৮ কেজি ধান জন্মায়।

(২) ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে ধানচাষ বৃষ্টিনির্ভর হওয়ার জন্য মৌসুমি বৃষ্টির আঞ্চলিক অনিশ্চিত চরিত্র, সামগ্রিকভাবে কৃষিক্ষেত্রে বন্যা, খরা প্রভৃতি দুর্যোগের সৃষ্টি করে।

(৩) ভূমিসংস্কার কার্যক্রমের অসম্পূর্ণ রূপায়ণের জন্য জোতের আয়তন ছোটো ও প্রান্তিক চরিত্রের। ফলে হেক্টর প্রতি উৎপাদন কম।

(৪) সবুজ বিপ্লবের আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতার জন্য ধানের উৎপাদন এখনও আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি পায়নি।

(৫) কৃষি-পরিকাঠামোর দুর্বলতা ধানচাষে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।

(৬) মূলধন, বিনিয়োগ ও পরিবহনের সমস্যা ধানের সীমিত উৎপাদনের জন্য দায়বদ্ধ।

[১] ICAR, 2008, Handbook of Agriculture

■ **ধানচাষের সমস্যাগুলি প্রতিকারের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়েছে :**

(১) ICAR (Indian Council of Agricultural Research) উন্নত প্রজাতির বীজ ও উন্নত কৃষিপ্রযুক্তি আবিষ্কারের মাধ্যমে ধানচাষকে লাভজনক ও বাণিজ্যভিত্তিক কৃষিতে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

(২) দ্বাদশ পরিকল্পনায় (২০১২–২০১৭) সম্পদের উন্নয়নের জন্য কৃষি, শিল্প, পরিবহন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সম্পদ সৃজনের নীতি রূপায়িত হয়েছে। যার সুফল ধানচাষের উপরেও পড়বে।

(৩) চাষের দুর্বল পরিকাঠামোকে সবল করার উদ্দেশ্যে শক্তি, পরিবহন, সংরক্ষণ ও জলসেচের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে দ্বাদশ পরিকল্পনায় গড়ে ৭ শতাংশ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। ফলে অন্যান্য চাষের সঙ্গে ধানের চাষও লাভবান হবে।

(৪) যান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থা রূপায়ণের চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

(৫) ১৯৮৫ সালে স্থাপিত ন্যাশনাল ওয়েস্টল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (National Wastelands Development Board—NWDB)-এর মাধ্যমে অব্যবহৃত জমিকে চাষের আওতায় আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।

(৬) ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত NABARD বা জাতীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক ইত্যাদির মাধ্যমে চাষীদের কৃষি ঋণের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

(৭) ধান চাষের উন্নতির জন্য জমির উৎপাদন-বর্ধক কৌশল (Production augmenting technique) ও শ্রমের পরিবর্ত কৌশল (labour substituting technique) ধীরে ধীরে গ্রহণ করা হচ্ছে।

(৮) শস্যবিমা (Crop Insurance) ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

০৭ ধানের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য *(International Trade)*

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চালের প্রাধান্য খুব কম। কারণ এশিয়া মহাদেশের ধান উৎপাদক অঞ্চলগুলি ঘনবসতিপূর্ণ। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পর উদ্‌বৃত্ত চালের পরিমাণ সামান্যই থাকে। বস্তুত, পৃথিবীর মোট উৎপাদিত ধানের প্রায় ৯০ শতাংশ খাদ্য হিসেবে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে ব্যবহৃত হয়। থাইল্যান্ড, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান, ইতালি, ভারত ইত্যাদি দেশ চাল রপ্তানি করে। বিপরীতভাবে ফিলিপিন্‌স, আফ্রিকার কোট ডি আইভরি, দক্ষিণ আফ্রিকা, সেনেগাল ইত্যাদি দেশ চাল আমদানি করে।

সারণি ১২.৬ : পৃথিবীর প্রধান ধান উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলির বণ্টন ও বৈশিষ্ট্য

[আফ্রিকা এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ধান নিবিড় জীবনধারণভিত্তিক কৃষির ফসল।]

■ ধানচাষের সমস্যাগুলি প্রতিকারের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়েছে :

(১) ICAR (Indian Council of Agricultural Research) উন্নত প্রজাতির বীজ ও উন্নত কৃষিপ্রযুক্তি আবিষ্কারের মাধ্যমে ধানচাষকে লাভজনক ও বাণিজ্যভিত্তিক কৃষিতে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

(২) দ্বাদশ পরিকল্পনায় (২০১২–২০১৭) সম্পদের উন্নয়নের জন্য কৃষি, শিল্প, পরিবহন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সম্পদ সৃজনের নীতি রূপায়িত হয়েছে। যার সুফল ধানচাষের উপরেও পড়বে।

(৩) চাষের দুর্বল পরিকাঠামোকে সবল করার উদ্দেশ্যে শক্তি, পরিবহন, সংরক্ষণ ও জলসেচের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে দ্বাদশ পরিকল্পনায় গড়ে ৭ শতাংশ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। ফলে অন্যান্য চাষের সঙ্গে ধানের চাষও লাভবান হবে।

(৪) যান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থা রূপায়ণের চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

(৫) ১৯৮৫ সালে স্থাপিত ন্যাশনাল ওয়েস্টল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (National Wastelands Development Board—NWDB)-এর মাধ্যমে অব্যবহৃত জমিকে চাষের আওতায় আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।

(৬) ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত NABARD বা জাতীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক ইত্যাদির মাধ্যমে চাষীদের কৃষি ঋণের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

(৭) ধান চাষের উন্নতির জন্য জমির উৎপাদন-বর্ধক কৌশল (Production augmenting technique) ও শ্রমের পরিবর্ত কৌশল (labour substituting technique) ধীরে ধীরে গ্রহণ করা হচ্ছে।

(৮) শস্যবিমা (Crop Insurance) ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

০৭ ধানের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (*International Trade*)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চালের প্রাধান্য খুব কম। কারণ এশিয়া মহাদেশের ধান উৎপাদক অঞ্চলগুলি ঘনবসতিপূর্ণ। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পর উদ্বৃত্ত চালের পরিমাণ সামান্যই থাকে। বস্তুত, পৃথিবীর মোট উৎপাদিত ধানের প্রায় ৯০ শতাংশ খাদ্য হিসেবে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে ব্যবহৃত হয়। থাইল্যান্ড, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান, ইতালি, ভারত ইত্যাদি দেশ চাল রপ্তানি করে। বিপরীতভাবে ফিলিপিন্‌স, আফ্রিকার কোট ডি আইভরি, দক্ষিণ আফ্রিকা, সেনেগাল ইত্যাদি দেশ চাল আমদানি করে।

সারণি ১২.৬ : পৃথিবীর প্রধান ধান উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলির বণ্টন ও বৈশিষ্ট্য
[আফ্রিকা এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ধান নিবিড় জীবনধারণভিত্তিক কৃষির ফসল।]

মহাদেশ	দেশ	মুখ্য ধান উৎপাদক অঞ্চল / রাজ্য	বাণিজ্যের প্রকৃতি
এশিয়া	চিন	জেচুয়ান, ইয়াংসি, উপকূলবর্তী দক্ষিণ-পশ্চিম ও উইঘর ধান অঞ্চল। ইয়াং-সিকিয়াং ও সিকিয়াং নদী অববাহিকা ধানচাষের জন্য প্রসিদ্ধ।	রপ্তানিকারক দেশ। রপ্তানির পরিমাণ অল্প।
	ভারত	পশ্চিম হিমালয়ের আর্দ্র অঞ্চল, গঙ্গা-শতদ্রুর শুষ্ক-প্রায় অঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গ-অসমের আর্দ্র নদীগঠিত সমভূমি, পূর্ব হিমালয়ের আর্দ্র অঞ্চল, মধ্য ভারতের উচ্চভূমি, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ও পূর্ব উপকূলবর্তী সমভূমি অঞ্চল। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা ও দক্ষিণ ভারতের নদীগুলির নিম্ন অববাহিকা ধানচাষের জন্য প্রসিদ্ধ।	রপ্তানিকারক দেশ। রপ্তানির পরিমাণ অল্প।

○ বাণিজ্যিক কৃষি ○

(Commercial Farming)

গম (Wheat)

যে কৃষি ব্যবস্থায় উৎপাদিত কৃষি পণ্যসামগ্রী বিদেশে রপ্তানী করে অর্থ উপার্জন করা হয়, তাকে বাণিজ্যিক কৃষি ব্যবস্থা বলে। এরূপ কৃষি ব্যবস্থায় কৃষক নিজের প্রয়োজন ছাড়া অপরের চাহিদাপূরণের স্বার্থে অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন জমিতে প্রধানত প্রযুক্তির সহায়তায় এই ধরনের কৃষিকাজ করে থাকে। এরূপ কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

- ❑ জনসংখ্যার তুলনায় জমির পরিমাণ অনেক বেশি।
- ❑ মাথাপিছু জমির পরিমাণ অধিক বলে মাথাপিছু ফলন বেশী, কিন্তু একর প্রতি উৎপাদন কম।
- ❑ প্রচুর পরিমাণে যন্ত্রের ব্যবহার হয়ে থাকে।
- ❑ শ্রমিকের স্বল্পতার দরুণ কৃষিক্ষেত্রে মজুরির অনুপাত অনেক বেশী।
- ❑ কৃষিতে মূলধনের বিনিয়োগের পরিমাণও অনেক বেশী।
- ❑ উন্নত মানের বীজ, সার ও কীটনাশকের প্রয়োগ এবং সেচব্যবস্থার প্রচলনের ফলে কৃষিতে অনিশ্চয়তার পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে কম।
- ❑ এরূপ কৃষিব্যবস্থায় যোগাযোগের ব্যবস্থাও উন্নত।
- ❑ কৃষিজ পণ্যের বাজারজাত করার সবরকম সুবিধা।
- ❑ এরূপ কৃষির প্রধান ফসল গম।

● **ব্যাপক বাণিজ্যিক কৃষি উৎপাদন—গম (Extensive Commercial Crop Farming–Wheat)**

গম মূলতঃ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলীয় ফসল। তবে, বর্তমানে উপক্রান্তীয় আবহাওয়াতেও গমের চাষ করা হয়। গমের বিজ্ঞান সম্মত নাম হল ট্রিটিকাম ইষ্টিভাম (Triticum aestivam Linn)।

গম প্রধানত উত্তর গোলার্ধের 30°-50° অক্ষাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও দক্ষিণ গোলার্ধে 20°-40° দক্ষিণ অক্ষাংশেও গমের চাষ লক্ষ্য করা যায়।

গম পৃথিবীর প্রধান খাদ্যশস্যের মধ্যে একটি অন্যতম দানাজাতীয় শস্য। গম হতে আটা, ময়দা, সুজি ইত্যাদি তৈরী হয়। এছাড়া বিস্কুট, কেক, পাউরুটি ইত্যাদিও গমের আটা হতে তৈরী হয়। গমের খড় গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই খড় হতে নিকৃষ্ট ধরনের কাগজও তৈরী হয়।

● **গমের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Wheat) ঃ**

গমের বীজ বপন ও ফসল সংগ্রহের সময় এবং আকৃতি ও প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। বীজ বপনের সময় অনুসারে একে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ (1) শীতকালীন গম ও (2) বসন্তকালীন গম।

❑ **শীতকালীন গম (Winter Wheat) ঃ** নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে শীতকালীন গমের চাষ হয়। উত্তর গোলার্ধে শীতের প্রারম্ভে অর্থাৎ নভেম্বর মাসে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে এপ্রিল-মে মাসে এই ফসলের বীজ বপন করা হয়।

গ্রীষ্মকালের গরমে এই ফসল পাকে। পৃথিবীর গম উৎপাদনের প্রায় 80% ভাগই শীতকালীন গম। এই গমের চাষ প্রধানত নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়।

- যুক্তরাষ্ট্রের তৃণভূমি অঞ্চলের অর্ন্তগত মিসৌরী, কানসাস, নেভাস্কা প্রভৃতি প্রধান।
- চীন দেশের হোয়োংহো নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলের পললযুক্ত সমভূমি অঞ্চলে এবং চীনের উত্তর ও পশ্চিমভাগে শীতকালীন গমের চাষ দেখতে পাওয়া যায়।
- জাপানের পূর্ব উপকূলের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে গমের চাষ হয়।
- ভারতের উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যে রবিশস্য হিসেবে শীতকালীন গমের চাষ হয়।

উপরে উল্লিখিত অঞ্চল ছাড়া দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা, নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণের সমুদ্র উপকূলের সমভূমি অঞ্চল, পাকিস্থান প্রভৃতি দেশেও শীতকালীন গমের চাষ হয়ে থাকে।

❑ **বসন্তকালীন গম (Spring Wheat) :** যে সব দেশে শীতকালীন তুষারপাত হয় সাধারণত সেইসব দেশে বসন্তকালে গমের চাষ হয়। সাধারণত বসন্তের প্রারম্ভে যখন বরফ গলে যায়। তখন ঐ বরফগলা ভিজে মাটিতে এই গমের চাষ হয়ে থাকে। বসন্তকালীন গমের চাষ প্রধানত কানাডা, পূর্বতন রাশিয়ার স্তেপ তৃণভূমি এবং সাইবেরিয়াতেও হয়ে থাকে। এই সব অঞ্চলে বসন্তকালে গমের চাষ হয় এবং হেমন্তের প্রথম দিকে গম সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

শীতকালীন বা বসন্তকালীন উভয় ধরণের গমকেই আবার তাদের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে তিনভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে : **(১) লাল গম, (২) সাদা গম ও (৩) ডুরামগম।**

➤ **লাল গম (Red Wheat) :** সাধারণত শীতল ও শুষ্ক অঞ্চলে এই লাল গমের চাষ হয়। এই গম শীত ও বসন্ত উভয় ঋতুতে জন্মায়। সাধারণত যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সি. আই. এস. এর অর্ন্তভূক্ত দেশসমূহ, মধ্য-ইউরোপে অঞ্চলে এই গমের চাষ বেশি হয়। এই গমের দানাগুলি ছোট বা মাঝারি হয় এবং এগুলি কঠিন প্রকৃতির গম বলে পরিচিত। এই গমে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকে। এই গমের ময়দায় পাউরুটি ভাল হয়।

➤ **সাদা গম (White Wheat) :** সাদা গম শীত বা বসন্ত উভয় ঋতুতেই জন্মায়। এই গমের দানাগুলি বড় হয়। এই গম নরম জাতের। জলীয় বাষ্প বেশি পরিমাণে থাকে এই গমের ময়দা হতে কেক, পেস্ট্রি, বিস্কুট ভাল হয়। এই গমের চাষ প্রধানত এশিয়ার অধিকাংশ দেশে, যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার চিলি প্রভৃতি অঞ্চলে হয়।

➤ **ডুরাম গম (Durum Wheat) :** এই গম বসন্তকালে জন্মায় এবং এটি কঠিন জাতের গম। ভারতের দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল, উত্তর পশ্চিম আফ্রিকার ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল এবং ইউরোপের বিভিন্ন অংশে এই গম জন্মাতে দেখা যায়।

- **গম চাষের উপযোগী ভৌগলিক অবস্থাসমূহ (Geographical conditions for wheat cultivation) :**

গম চাষের বিভিন্ন ভৌগলিক অবস্থাগুলি নিচে সারণিতে দেওয়া হল।

সারণি

গম চাষের ভৌগলিক অবস্থাসমূহ

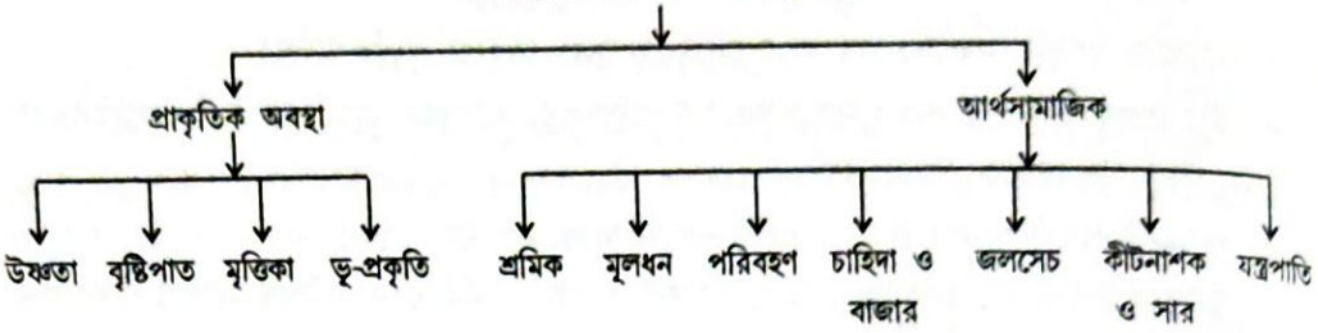

● **প্রাকৃতিক অবস্থাসমূহ (Physical conditions) :**

উষ্ণতা : গম উৎপাদনের জন্য কমপক্ষে 10°–20° সেঃ উত্তাপের প্রয়োজন। অত্যধিক উত্তাপে গমের দানাগুলির পুষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটায়। তাই গম চাষের জন্য নাতিশীতোষ্ণ ও শীতল আবহাওয়া প্রয়োজন।

বৃষ্টিপাত : গম চাষের জন্য সাধারণত অধিক জলের প্রয়োজন হয় না। কারণ গম অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলে চাষ হয়। গম চাষের জন্য মোটামুটিভাবে গড়ে 50–100 সে.মি. বৃষ্টিপাত ও 110টি তুহিনমুক্ত দিবসের প্রয়োজন হয়।

মৃত্তিকা : উর্বর দোঁ-আঁশ মাটি গম চাষের পক্ষে অনুকূল। আমেরিকার প্রেইরী অঞ্চলের গাঢ় বাদামী এবং পর্ণমোচী বনভূমির পডজল মাটি বা জৈব পদার্থে মিশ্রিত কালো মাটি বা চেরনোজেম মাটি গম চাষের পক্ষে অনুকূল। গম চাষের ফলে জমির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। তাই মাটির উর্বরতা শক্তি বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সারের ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন।

ভূ-প্রকৃতি : গম চাষের জন্য ব্যাপকভাবে জলনিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত প্রায় সমতলভূমি বা সামান্য ঢালবিশিষ্ট জমিই উপযুক্ত। কারণ সমতলভূমিতে জলসেচ করা সহজ হয়। আবার সমতলভূমিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারও সহজ হয়। সাধারণত ধান কেটে গমের চাষের বিশেষ প্রচলন দেখা যায় না। তবে চাষের জমির অভাবে অনেক সময় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে গম চাষ করা হয়ে থাকে।

● **আর্থ সামাজিক কারণসমূহ (Socio Economic Causes)**

শ্রমিক : জমি তৈরী থেকে শুরু করে শস্য বপন, কর্তন ইত্যাদি কাজে প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। তবে বর্তমানে উন্নত দেশগুলিতে গমের চাষ করার জন্য জমি তৈরী হতে শুরু করে বীজবপন, ফসল কাটা বা সংগ্রহ করা ইত্যাদি সব কাজেই যন্ত্রের ব্যবহার করা হয় বলে বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। তবে পৃথিবীর ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলি যথা ভারত, চীন প্রভৃতি দেশে যন্ত্রের চেয়ে মানুষের ব্যবহার বেশী হয়ে থাকে।

মূলধন : বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়, উৎকৃষ্ট বীজ ও সার, কীটনাশক ইত্যাদি সর্বপ্রকার কার্যে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়। মূলধনের অভাবে গমের চাষ ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে গম চাষে প্রসিদ্ধি হওয়ার কারণ হল এই সকল অঞ্চলের চাষীদের মূলধনের সহজলভ্যতা।

চাহিদা ও বাজার ঃ পৃথিবীতে খাদ্যশস্যের বাজারে গমের স্থান প্রথম। বিশ্বের বাজারে গমের প্রচুর চাহিদা থাকার দরুন পৃথিবীর বহুদেশ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গমের চাষ করে থাকে। তাই দেখা যায় বাজারের চাহিদার উপর গমের চাষ অনেকাংশে নির্ভরশীল।

পরিবহণ ব্যবস্থা ঃ গম বাজারভিত্তিক ফসল হওয়ার দরুণ উৎপাদিত অঞ্চল ও দেশ বিদেশের বাজারের মধ্যে সুলভ ও সহজলভ্য পরিবহণের একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া, কৃষিক্ষেত্রে বীজ, সার, শ্রমিক, যন্ত্রপাতি বহন বা শস্যক্ষেত্র হতে ফসল সংগ্রহের জন্যও সুলভ পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজন। এই কারণে গম উৎপাদন সমৃদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেইরী অঞ্চল বা রাশিয়ার গম উৎপাদক অঞ্চলে উন্নত রেল ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে।

জলসেচ ঃ গম উৎপাদনের প্রাকৃতিক পরিবেশগুলির অনুকূল অবস্থান থাকলে কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে জলসেচের দ্বারা গম চাষ করা সম্ভব হয়। ভারত, পাকিস্থান, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে জলসেচের সহায়তায় ব্যাপকভাবে গমের চাষ হয়ে থাকে।

কীটনাশক ও সার ঃ কীট পতঙ্গের আক্রমণ ও কীটপোকার হাত থেকে গম চাষকে রক্ষা করার জন্য কীটনাশক ব্যবহার করা প্রয়োজন। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে বিমানের সহায়তায় তাদের বিস্তৃত গম ক্ষেত্রগুলিতে কীটনাশক ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

গম উৎপাদনের ফলে মাটির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণভাবে দেখা যায় যে মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কমে যায়। তাই এই সব ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন এবং অন্যান্য সারের ব্যবহারের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

যন্ত্রপাতি ঃ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিরাট এলাকা জুড়ে গম চাষের জন্য বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয়। এদের মধ্যে ট্রাক্টর, কম্বাইণ্ড হারভেষ্টর, সিভার ইত্যাদি প্রধান। বিভিন্ন উন্নত দেশগুলিতে গম চাষের উন্নতির মূলে এই যন্ত্রপাতির ব্যবহার এক বিশেষ ভূমিকা বহন করে থাকে।

এইসব কারণ ছাড়া গম উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে গমের ব্যবহার ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগ এক বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকে।

● ভারতের গম উৎপাদন (Production of Wheat in India)

ভারতঃ 2003 সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী গম উৎপাদনে ভারতের স্থান ছিল পৃথিবীতে দ্বিতীয় এবং উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় 6.51 কোটি টন। এদেশে সাধারণত অক্টোবর, নভেম্বর মাসে গম চাষ শুরু হয় এবং মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে ফসল কাটা হয়। অর্থাৎ ভারতের এই শস্য রবিশস্য হিসাবে চাষ হয়। ভারতে বিভিন্ন বছরে গমের উৎপাদন ও উৎপাদক অঞ্চল এবং হেক্টর প্রতি উৎপাদন নিচের সারণীতে দেখান হল।

সারণি

ভারতের গম উৎপাদন ('000 টন)

বছর	1990-91	2000-01	2005-06	2006-07	2007-08
উৎপাদন ('000 টন)	55.135	69.681	69.355	75.807	78.570
উৎপাদক অঞ্চল ('000 হেক্টর)	24.167	25.731	26.484	27.995	28.039

Source : Statistical Pocket Book India 2008

সারণি

ভারতের প্রধান গম উৎপাদক অঞ্চলসমূহ (2002-03)

ক্রমিক নম্বর	রাজ্য	উৎপাদন		উৎপাদন অঞ্চল		হেক্টর/ কুইন্টাল প্রতি উৎপাদন
		লক্ষ টন	ভারতের মোট উৎপাদনের % পরিমাণ	লক্ষ হেক্টর	ভারতের মোট উৎপাদক অঞ্চলের %	
1.	উত্তরপ্রদেশ	236.12	36.27	90.94	36.58	26.0
2.	পাঞ্জাব	141.75	21.77	33.75	13.58	42.0
3.	হরিয়ানা	91.92	14.12	22.68	9.12	40.5
4.	রাজস্থান	48.78	7.49	18.01	7.24	27.1
5.	মধ্যপ্রদেশ	42.85	6.34	21.66	8.72	19.0
	অন্যান্য	48.31	7.42	30.77	12.38	—
	ভারত	**650.96**	**100.00**	**248.60**	**100.00**	**26.2**

Source : Data computed from Statistical Abstract, India 2003, pp. 26, 29 and 32.

● **উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের গম চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থা :**

জলবায়ু : শীতকালে উষ্ণতা 10°-15° সেঃ এবং গ্রীষ্মকালে 21°-26° সেঃ প্রয়োজন। ভারতে 50-70 সে.মি. বৃষ্টিপাত গম চাষের পক্ষে আদর্শ। দক্ষিণ ভারতের বৃষ্টিপাত উত্তর ভারতের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশী হয়। বেশী বৃষ্টিপাত গম চাষের পক্ষে ক্ষতিকর।

সারণি

ভারতের গম উৎপাদন ('000 টন)

বছর	1990-91	2000-01	2005-06	2006-07	2007-08
উৎপাদন ('000 টন)	55.135	69.681	69.355	75.807	78.570
উৎপাদক অঞ্চল ('000 হেক্টর)	24.167	25.731	26.484	27.995	28.039

Source : Statistical Pocket Book India 2008

সারণি

ভারতের প্রধান গম উৎপাদক অঞ্চলসমূহ (2002-03)

ক্রমিক নম্বর	রাজ্য	উৎপাদন		উৎপাদন অঞ্চল		হেক্টর/ কুইন্টাল প্রতি উৎপাদন
		লক্ষ টন	ভারতের মোট উৎপাদনের % পরিমাণ	লক্ষ হেক্টর	ভারতের মোট উৎপাদক অঞ্চলের %	
1.	উত্তরপ্রদেশ	236.12	36.27	90.94	36.58	26.0
2.	পাঞ্জাব	141.75	21.77	33.75	13.58	42.0
3.	হরিয়ানা	91.92	14.12	22.68	9.12	40.5
4.	রাজস্থান	48.78	7.49	18.01	7.24	27.1
5.	মধ্যপ্রদেশ	42.85	6.34	21.66	8.72	19.0
	অন্যান্য	48.31	7.42	30.77	12.38	—
	ভারত	**650.96**	**100.00**	**248.60**	**100.00**	**26.2**

Source : Data computed from Statistical Abstract, India 2003, pp. 26, 29 and 32.

● **উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের গম চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থা :**

জলবায়ু : শীতকালে উষ্ণতা 10°-15° সেঃ এবং গ্রীষ্মকালে 21°-26° সেঃ প্রয়োজন। ভারতে 50-70 সে.মি. বৃষ্টিপাত গম চাষের পক্ষে আদর্শ। দক্ষিণ ভারতের বৃষ্টিপাত উত্তর ভারতের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশী হয়। বেশী বৃষ্টিপাত গম চাষের পক্ষে ক্ষতিকর।

মৃত্তিকা : নাইট্রোজেন, পটাশ ও ফসফেট সমৃদ্ধ ভারী উর্বর দোয়াশ মৃত্তিকা বা হাল্কা মাটি গম চাষের পক্ষে উপযুক্ত। উত্তর ভারতের গম উৎপাদক অঞ্চল উর্বর দোয়াশ পাললিক মৃত্তিকায় গঠিত। দক্ষিণ ভারতের লাভা সমৃদ্ধ কৃষ্ণ মৃত্তিকায় Triticum Durum জাতীয় গম এবং নীলগিরি অঞ্চলের লোহিত মৃত্তিকায় Triticum Dicoccum জাতীয় গম চাষ হয়।

ভারতের প্রধান প্রধান গম উৎপাদক অঞ্চল যদিও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত, তবু ও ভারতের প্রধান গম উৎপাদন অঞ্চলগুলিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। (a) উত্তর পশ্চিম অঞ্চল, (b) উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল (c) উত্তর পূর্বাঞ্চল (d) মধ্যাঞ্চল এবং (e) দক্ষিণাঞ্চল। তবে এই অঞ্চলগুলির মধ্যে যে সকল রাজ্যগুলি প্রধানভাবে গম উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ, সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা হল।

- **ভারতের প্রধান গম উৎপাদন অঞ্চল (Main wheat producing Area of India) :**

গমের বীজ বপন ও ফসল সংগ্রহের সময় এবং আকৃতি ও প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। বীজ বপনের সময় অনুসারে একে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। (1) শীতকালীন গম ও (2) বসন্তকালীন গম।

1. **উত্তরপ্রদেশ (Uttar Pradesh) :** ভারতে সর্বাপেক্ষা অধিক গমের চাষ হয় উত্তরপ্রদেশে। সমগ্র ভারতের উৎপাদনের শতকরা 36.27 ভাগ উৎপাদন হয় এই রাজ্যে। 2002-03 সালে এই রাজ্যে উৎপাদিত হয়েছিল 236.12 লক্ষ টন। বিশাল গঙ্গা ও তার ছোট বড় বিভিন্ন উপনদী গঠিত অববাহিকার সমভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা এবং বিভিন্ন ছোট বড় জলসেচ প্রকল্প এই রাজ্যকে গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে শীর্ষ স্থানে নিয়ে গেছে। গঙ্গা-ঘর্ঘরা-দোয়াব এবং গঙ্গা-যমুনা-দোয়াব হল দুটি প্রধান গম উৎপাদক অঞ্চল। এই দুটি দোয়াব অঞ্চল হতে সমগ্র উত্তরপ্রদেশের মোট উৎপাদনের শতকরা 75 ভাগ আসে। উত্তরপ্রদেশের প্রায় 53টি জেলার মধ্যে 43টি জেলাই উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে শাহারানপুর, মুজাফরনগর, মিরাট, মোরাদাবাদ, রামপুর, বুদাউন, ইটাওয়া, হরিদ্বার, খেরী, গোন্ডা, বস্তি ইত্যাদি জেলা প্রধান। উত্তর প্রদেশে গমের উৎপাদন বেনারসের পূর্বদিক থেকে ধীরে ধীরে কমতে থাকে। এর কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে অত্যধিক বৃষ্টিপাত ও মৃত্তিকা ক্ষয়।

2. **পাঞ্জাব (Punjab) :** পাঞ্জাব ভারতের আর একটি উল্লেখযোগ্য গম উৎপাদক অঞ্চল। সবুজ বিপ্লব পাঞ্জাবকে গম উৎপাদনের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। পরিকল্পিত সুন্দর সেচব্যবস্থা। সিন্ধু নদী বাহিত উর্বব মৃত্তিকা, হালকা বৃষ্টিপাত, পশ্চিমী ঝঞ্ঝা, সর্বোপরী উন্নত চাষব্যবস্থা সব কিছু একত্রে মিলিত হয়ে পাঞ্জাবের গম উৎপাদনকে উন্নতির শিখরে নিয়ে গেছে। ভারতের গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে পাঞ্জাব শতকরা 21.77 ভাগ উৎপাদন করে, ভারতের মোট গম চাষের শতকরা 13.58 ভাগ কৃষি অঞ্চল এখানে আছে। এখানে হেক্টর প্রতি উৎপাদন 42 কুইন্টাল যা ভারতের মধ্যে সর্বাধিক। পাঞ্জাবের মোট 12টি জেলা গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। এদের মধ্যে জলন্ধর, লুধিয়ানা, সাংরুন, ভাতিন্দা, অমৃতসর, ফিরোজপুর, ফরিদকোট, মানসা, কাপুরথালা, ফতেগড় সাইব, রূপনগর এবং পাতিয়ালা প্রধান।

এই রাজ্যে চাহিদার তুলনায় উদ্বৃত্ত থাকে বলে গম অন্যান্য রাজ্যে রপ্তানী হয়।

3. **হরিয়ানা (Haryana) :** ভৌগোলিক কারণ বিচার করলে দেখা যায় যে গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে হরিয়ানার পরিবেশ পাঞ্জাবের মতই অনুকূল। তবে হেক্টর প্রতি উৎপাদন কিছু কম (হেক্টর প্রতি 40.5 কুইন্টাল, 2003-04) পাঞ্জাবের মত হরিয়ানার এই উৎপাদন বৃদ্ধির কারণ সবুজ বিপ্লব। বর্তমানে ভারতের মোট গম উৎপাদক অঞ্চলের

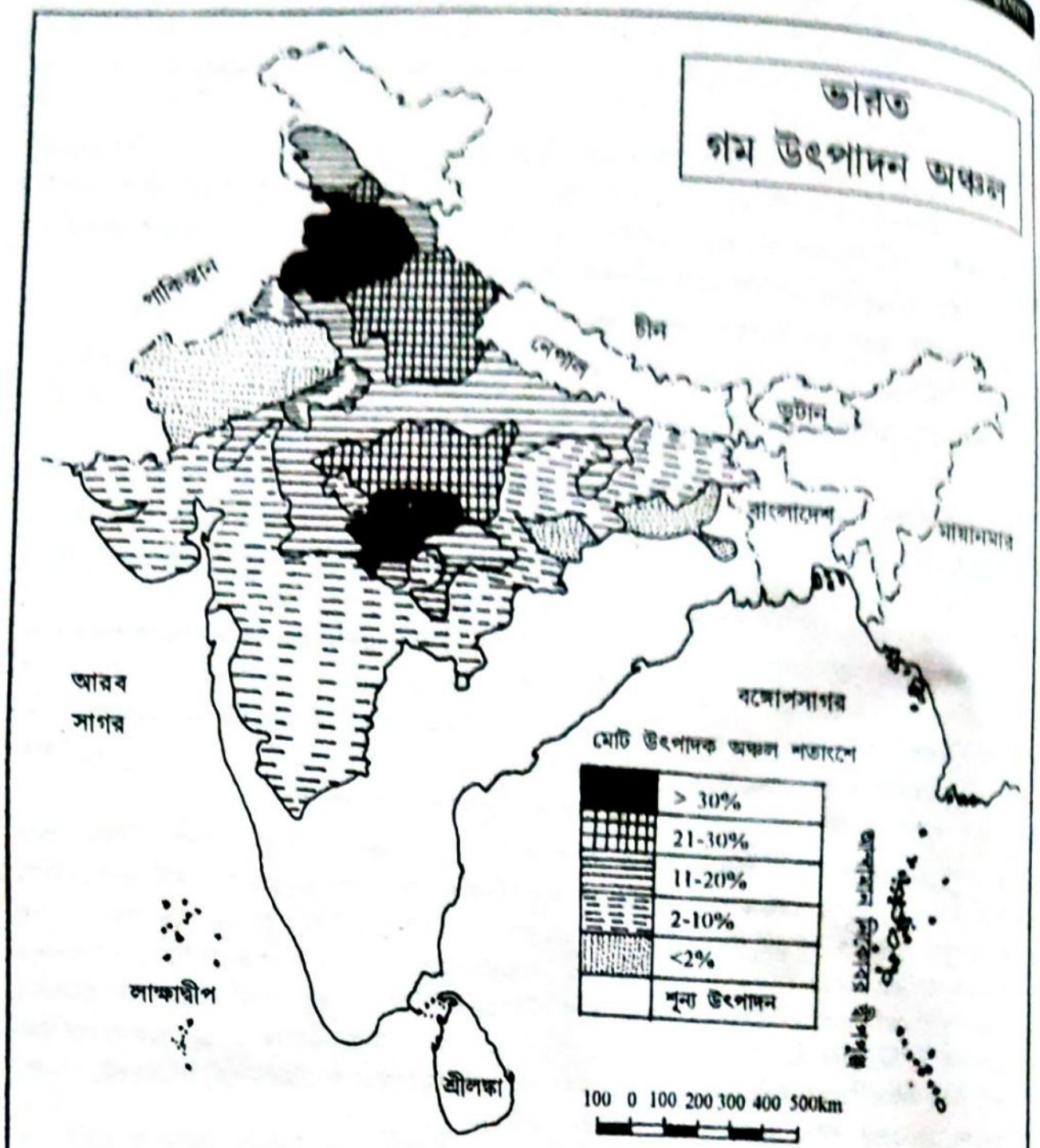

চিত্র 38 : ভারত (গম উৎপাদন অঞ্চল শতকরা হিসেবে)

শতকরা 9 ভাগ অঞ্চলে এদেশের শতকরা 14 ভাগ গম উৎপাদিত হয়। এখানকার প্রধান উৎপাদক জেলাগুলি হল কার্নাল, কুরুক্ষেত্র, আম্বালা, কৈথাল, পানিপথ, রোহটক, জিন্দ (Jind), হিসাব, শিরসা এবং গুরগাঁও।

4. **রাজস্থান (Rajasthan) :** বিরাট বালুকাময় মরুভূমি, বৃষ্টিপাত এবং সেচ ব্যবস্থার স্বল্পতা বহুদিন পর্যন্ত রাজস্থানের গম উৎপাদক অঞ্চলকে সীমিত করে রেখেছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সেচখালের উন্নতির ফলে, বিশেষত ইন্দিরাগান্ধী খাল খনন করার পর উৎপাদনের বিপুল পরিবর্তন ঘটে। বর্তমানে রাজস্থান ভারতের মোট উৎপাদনের শতকরা 7.49 ভাগ উৎপন্ন করে। এ রাজ্যে ভারতের শতকরা 7.24 ভাগ গম রয়েছে। হেক্টর প্রতি উৎপাদন গড়ে 27.1 কুইন্টাল। এই রাজ্যের 20টির বেশী জেলায় গম উৎপাদিত হলেও এর মধ্যে 11টি জেলায় সর্বাধিক গম উৎপাদিত হয়। এই অঞ্চলগুলি হল গঙ্গানগর, হনুমানগাঁও, ভরতপুর, কোটা, আলোয়ার, জয়পুর, চিতোরগড়, টংক, সোয়াই মাধোপুর, উদয়পুর এবং পালি।

5. **মধ্যপ্রদেশ (Madhya Pradesh) :** ভারতের গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে মধ্যপ্রদেশের 30 লক্ষ হেক্টরের ওপরে জমিতে গমের উৎপাদন হয়। হেক্টর প্রতি উৎপাদন 13.9 কুইন্টাল। এখানকার প্রধান উৎপাদক কেন্দ্রগুলি হল সাগর, বিদিশা, টিকামগড়, মোরেনা, গেহোরি, গোয়ালিয়র, গুণা, সাতনা, ভিন্দ এবং দুঙ্গারপুর।

6. **বিহার (Bihar) :** গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতের মধ্যে বিহারের স্থান ষষ্ঠ। যদিও ভারতের মধ্যে উৎপাদক অঞ্চলের শতকরা পরিমাণ কম কিন্তু হেক্টর প্রতি উৎপাদন 19.0 কুইন্টাল। প্রধান উৎপাদন অঞ্চলগুলি উত্তর বিহার সমভূমি অঞ্চলে অবস্থিত। ভোজপুর, সারণ, নালন্দা, পশ্চিম ও পূর্ব চম্পারণ, সিওয়ান এবং বেগুসরাই জেলা উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

উপরে বর্ণিত অঞ্চলগুলি ব্যতিত ভারতের অন্যান্য গম উৎপাদন অঞ্চলগুলির মধ্যে প্রধান হল গুজরাট, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, হিমালয় প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং কর্ণাটক রাজ্যেও গমের চাষ হয়।

(i) গুজরাট (Gujrat)—মাহী ও সবরমতী উপত্যকা, মাহেসানা, জুনাগড়, ভটনগর, আজ্রিলী, ভারুর, রাজকোট, খেদা প্রধান।

(ii) মহারাষ্ট্র (Maharastra)—ওয়ার্ধা, তাপি, গোদাবরী, ভীমা, পূর্টা এবং কৃষ্ণা নদীর উপত্যকা অঞ্চলে এবং নাগপুর, আকোলা, অমরাবতী, ঔরঙ্গাবাদ, নাসিক, পুনে প্রধান উৎপাদন অঞ্চল।

(iii) পশ্চিমবঙ্গ (West Bengal)—বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, নদীয়া প্রধান।

(iv) হিমাচলপ্রদেশ (Himachal Pradesh)—কাংরা, মাণ্ডি, শিরমাউর, উনা প্রদেশে গম উৎপাদিত হয়।

(v) জম্মু ও কাশ্মীর (Jammu & Kashmir)—শ্রীনগর, বারমুলা, ডোডা, অনন্তনাগ, জম্মু ও পুঞ্চ ইত্যাদি প্রধান।

১২

খাদ্যশস্য

(Food Crops)

১২.০১ গম (Wheat)

গম, গ্রামিনি গোত্রভুক্ত উদ্ভিদ এবং পৃথিবীর শীতপ্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের প্রধান ফসল। এশিয়া মাইনর এবং পশ্চিম এশিয়ায় প্রথম গম গাছের সন্ধান পাওয়া যায়। পৃথিবীতে যে-সমস্ত শস্যকে মানুষ প্রথম খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের জন্য গার্হস্থায়ন (domestication) করেছে, তাদের মধ্যে গম অন্যতম। আজ থেকে প্রায় ৭০০০-৭৫০০ বছর আগে জর্ডনে গম প্রথম গার্হস্থায়িত হয়েছিল (সূত্র : উইকিপিডিয়া)। গমের বিজ্ঞানসম্মত নাম **ট্রিটিকাম ইস্টিভাম** (*Triticum aestivum* Linn.)। গমের কয়েকটি বিশেষ প্রজাতি হল **ট্রিটিকাম ডাইককাম** (*T. dicoccum*), **ট্রিটিকাম স্ফিরোককাম** (*T. sphaerococcum*), **ট্রিটিকাম ডিউরাম** (*T. durum*) ইত্যাদি। গমগাছ ১ থেকে ১·৬ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। গম বাণিজ্যভিত্তিক ব্যাপক কৃষিব্যবস্থার (extensive commercial) প্রধান ফসল। পৃথিবীর অধিকাংশ গম উৎপাদক এলাকা উত্তর গোলার্ধে ১৫°–৬০° উত্তর অক্ষাংশ ও দক্ষিণ গোলার্ধে ২৫°–৪০° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

০১ গমের গুরুত্ব ও ব্যবহার *(Importance and Uses of Wheat)*

গম পৃথিবীর **প্রধান খাদ্যশস্য**। এটি পৃথিবীর **তৃতীয় সর্বাপেক্ষা বেশি উৎপাদিত শস্য (প্রথম স্থানে রয়েছে ভুট্টা** এবং **দ্বিতীয় স্থানে ধান)**। প্রসঙ্গত, পৃথিবীতে **গম উৎপাদক এলাকার** আয়তন সবচেয়ে বেশি। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও **গমের বাণিজ্যিক পরিমাণ** অন্যান্য শস্যের তুলনায় বেশি। ভুট্টা এবং ধানের তুলনায় **গমে উদ্ভিদজাত প্রোটিন সবচেয়ে বেশি** পাওয়া যায়। প্রাচীন নগর সভ্যতার উদ্ভবে গমের অবদান আছে বলে সমাজ বিজ্ঞানীরা মনে করেন। কারণ অন্যান্য খাদ্যশস্যের তুলনায় **গম অনেক বেশি দিন মজুত করে রাখা যায়।** কাগজ উৎপাদনের জন গমের খড় কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। গম আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান পণ্য। গমের খড় ছাদের ছাউনি দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়। বছরের বারো মাসের কোনো না কোনো মাসে, পৃথিবীর কোথাও না কোথাও, গম চাষ করা হয়।

০২ গমের শ্রেণিবিভাগ *(Classification of Wheat)*

বীজবপন ও ফসল সংগ্রহের সময় অনুসারে এবং রং ও কাঠিন্যের ভিত্তিতে গমের শ্রেণিবিভাগ করা যায়—

■ **বীজবপন ও ফসল সংগ্রহের সময় অনুসারে গমের শ্রেণিবিভাগ :** আলোচ্য প্রসঙ্গ অনুসারে, গম দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত। যেমন — (১) শীতকালীন গম ও (২) বাসন্তিক গম।

(১) শীতকালীন গম (Winter wheat) : শীতকালীন গমের বীজ শীতের প্রারম্ভে বপন করা হয়। উত্তর গোলার্ধে সাধারণত নভেম্বর মাসে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে এপ্রিল বা মে মাসে শীতকালীন গমের বীজ রোপণের কাজ শেষ করা হয়।

গ্রীষ্মের উষ্ণতায় গম পরিপক্ক হওয়ার পর, সুবিধামতো, শরতের আগে ফসল কাটা হয়। পৃথিবীর মধ্য অক্ষাংশের উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ এবং উপক্রান্তীয় বলয়ের শীতকালীন আবহাওয়া গমচাষের উপযুক্ত। পৃথিবীর প্রায় ৮০ (আশি) শতাংশ গম "শীতকালীন" শ্রেণির। শীতকালীন গম দু'ধরনের — শক্ত ও নরম। শক্ত শীতকালীন গম সাধারণত পাউরুটি তৈরির জন্য ও নরম জাতের শীতকালীন গম কেক, পেস্ট্রির জন্য ব্যবহার করা হয়।

● **শীতকালীন গম চাষের বণ্টন :**

(ক) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পেডালফার (Pedalfers) মৃত্তিকা অঞ্চল ও উর্বর তৃণভূমি বলয়ের অন্তর্গত কানসাস, মিসৌরি, নেব্রাস্কা প্রদেশে শীতকালীন গম চাষ করা হয়।

(খ) চিনের হোয়াং-হো ব-দ্বীপ এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভাগে শীতকালীন গম চাষের প্রচলন আছে।

(গ) জাপানে ৩৭° উত্তর অক্ষাংশের দক্ষিণে প্রধানত পূর্ব উপকূল বরাবর শীতকালীন গম চাষ করা হয়ে থাকে। হনসু দ্বীপের দক্ষিণ অংশ, কিউসু ও সিকোকু দ্বীপে গমের চাষ হয়।

(ঘ) ভারতে রবিশস্য হিসেবে গম চাষ করা হয়। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান ইত্যাদি প্রদেশে গম প্রধানত শীতকালে উৎপন্ন হয়।

(ঙ) এ ছাড়া, আলজিরিয়া, মরক্কো, ইজিপ্ট, লিবিয়া, টিউনিশিয়া, তানজানিয়া, জিম্বাবোয়ে, আর্জেন্টিনা, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে শীতকালীন ফসল হিসেবে গমের চাষ হয়।

(২) **বাসন্তিক গম (Spring wheat) :** বাসন্তিক গমের বীজ বসন্তের প্রারম্ভে বপন করা হয়। এই সময় দীর্ঘ শীতের শেষে বরফ-গলা জলে মাটি ভিজে থাকে। ফলে জলসেচের প্রয়োজনীয়তা অনেকাংশে হ্রাস পায়। কার্যত পৃথিবীর যে-সমস্ত অঞ্চলে শীতকালে তুষারপাত হয় এবং মাটি চাষের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে, সেখানে কৃষির অন্যান্য উপাদান মজুত থাকলে, বাসন্তিক গম, শীতের অবসানে চাষ করা যায়। শক্ত ও নরম — দু'ধরনের বাসন্তিক গম আছে।

● **বাসন্তিক গমচাষের বণ্টন :**

(ক) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে উত্তর ও দক্ষিণ ডাকোটা, মনটানা, ওয়াইওমিং প্রভৃতি অঞ্চলে বাসন্তিক গম চাষ করা হয়। বিশেষত, মিসিসিপি ও লোহিত নদীর (Red River) উপত্যকা বসন্তকালীন গমচাষের জন্য বিশেষ উপযুক্ত।

(খ) কানাডার দক্ষিণাঞ্চলে বিস্তীর্ণ প্রেইরি (Prairie) ক্ষেত্রে অর্থাৎ ম্যানিটোবা, সাসকাচুয়ান ও আলবার্টা প্রদেশের সমতলভূমিতে বাসন্তিক গমের চাষ হয়।

(গ) রাশিয়া, ইউক্রেন, কাজাখস্তান, কিরজিস্তান, উজবেকিস্তানের স্তেপ তৃণভূমি অঞ্চলে এবং সাইবেরিয়ার ব্যাপক অঞ্চলে গম বসন্তকালীন ফসল।

■ **রং ও কাঠিন্যের ভিত্তিতে গমের শ্রেণিবিভাগ :** রং ও কাঠিন্য অনুসারে, গম তিন প্রকার। যেমন— (১) সাদা গম, (২) ডুরাম গম ও (৩) শক্ত লাল গম।

(১) **সাদা গম (White wheat) :** সাদা গম নরম জাতের হয়। শীত ও বসন্ত দুই ঋতুতেই এ-জাতের গম চাষ করা যায়। এশিয়া, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন অংশে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে, দক্ষিণ আমেরিকার চিলিতে সাদা গমের চাষ হয়। এর দানাগুলি বড়ো।

(২) **ডুরাম গম (Durum wheat) :** ডুরাম গম কঠিন জাতের বসন্তকালীন গম। ভারতে বিশেষত দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলে ডুরাম গমের চাষ হয়। উত্তর আফ্রিকার ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এবং ইউরোপের বিভিন্ন অংশে এ-জাতীয় গমের চাষ দেখা যায়। ডুরাম গমের দানাগুলি মাঝারি থেকে বড়ো মাপের।

(৩) **শক্ত লাল গম (Hard red wheat) :** শীত ও বসন্ত দুই ঋতুতেই শক্ত লাল গম চাষ করা যায়। কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন, মধ্য ইউরোপ, আর্জেন্টিনার বিভিন্ন অংশে লাল কঠিন গমের চাষ হয়। এ-জাতীয় গমের দানাগুলি ছোটো থেকে মাঝারি মাপের।

০৩ উচ্চফলনশীল গম *(High Yielding Variety Wheat)*

উচ্চফলনশীল গমের বীজ হল সোনালী, দেবা, ইন্দ্র, রাজলক্ষ্মী ইত্যাদি। ভারতে উচ্চফলনশীল প্রজাতির প্রায় ২৫০ রকম গমবীজ থেকে ভালো ফলন পাওয়া সম্ভব হয়েছে। **অধ্যাপক নরম্যান বোরলগ** (Prof. Norman Borlaug) মেক্সিকোতে ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি উচ্চফলনশীল গমবীজ উদ্ভাবন করেন। ভারত সরকার ১৯৬৬–'৬৭ সালে উচ্চফলনশীল গমের ব্যাপক ব্যবহার শুরু করেন। ফলে সবুজ বিপ্লব ত্বরান্বিত হয়। ১৯৬৬–'৬৭ সালে দেশে উচ্চফলনশীল বীজের আওতায় জমির পরিমাণ ছিল ৪০ লক্ষ হেক্টর। ২০১৬ সালে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২·৮৫ কোটি হেক্টরে। অর্থাৎ বিগত ৫০ বছরে উচ্চফলনশীল জাতের গম চাষের অন্তর্গত জমির পরিমাণ প্রায় সাত গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

০৪ ভৌগোলিক পরিবেশ *(Geographical Conditions)*

গম উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থা হল —

(১) **উষ্ণতা :** শুষ্ক নাতিশীতোষ্ণ বা শীতপ্রধান আবহাওয়া গম চাষের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে। উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু এই চাষের উপযুক্ত নয়। গমগাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য ১৫°–২০° সে. উষ্ণতার প্রয়োজন। অধিক উত্তাপে গমের দানাগুলি পরিপুষ্ট হয় না। বীজ বপনের পর অন্তত ছ'সপ্তাহ আবহাওয়া শীতল থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই সময়ে ১৫°–২২° সে. গড় উষ্ণতা চাষের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে।

(২) **বৃষ্টিপাত :** গম অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলের ফসল। সেজন্য গম চাষে জলের প্রয়োজন সীমিত। গড়ে বাৎসরিক ৫০–১০০ সেমি বৃষ্টিপাত ও ১১০টি তুহিনমুক্ত দিন গম চাষের অনুকূল।

(৩) **জলসেচ :** সেচসেবিত এলাকায় গমের ভালো ফলনের জন্য প্রথম সেচ — বীজ বপনের তিন সপ্তাহ পরে, দ্বিতীয় সেচ — বপনের ছ'সপ্তাহ পরে, তৃতীয় সেচ— ফুল ধরার সময় ও চতুর্থ সেচ — দানা নরম থাকাকালীন প্রয়োগ করতে হয়।

(৪) **গম চাষের উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি :**

(ক) জিরো টিলেজ সিস্টেম : এই পদ্ধতিতে গমের বীজ রোপণ করার জন্য জমি তৈরি করার প্রয়োজন হয় না। ফলে ডিজেলের সাশ্রয় হয় ৯০%-এর বেশি।

(খ) ফারো ইরিগেটেড রেইজড বেড্‌স (FIRBS) সিস্টেম : এই পদ্ধতিতে গম চাষ করলে অন্তত ২৫% জল এবং ২৫% বীজ ও সারের সাশ্রয় হয়।

(৫) **মাটি :** ঈষৎ অম্লধর্মী দো-আঁশ, বেলে-দো-আঁশ, পলি-দো-আঁশ বা এঁটেল-দো-আঁশ মাটি গম চাষের উপযোগী। আমেরিকার প্রেইরি অঞ্চলের গাঢ়-বাদামি মাটি ও পর্ণমোচী বনাঞ্চলের পডজল মাটি, ইউক্রেন ও সংলগ্ন ক্ষেত্রের "কৃষ্ণমৃত্তিকা" বা 'চেরনোজেম' মাটি গম চাষের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। অধিক ও নির্ভরযোগ্য ফলনের জন্য জমির উর্বরাশক্তি বজায় রাখা দরকার। সেজন্য প্রয়োজনমতো নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ, জিংক সালফেট ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থ মাটিতে প্রয়োগ করতে হয়।

(৬) **ভূমি :** ভালো জলনিকাশি বন্দোবস্তযুক্ত প্রায় সমতল ভূমি বা অল্প ঢালু জমিতে গম চাষ করা হয়। পাহাড়ের খাড়া ঢালে, ধাপ কেটে, সাধারণত গম চাষ করা হয় না। তবে চাষযোগ্য জমির খুব অভাব হলে পাহাড়ি ঢালে ধাপ কাটার

বা টেরেস (terrace) তৈরি করার প্রয়োজন হয়। বাণিজ্যভিত্তিক বৃহদায়তন গম চাষে যন্ত্রের ব্যবহার ব্যাপক বলে আবাদি জমি সমতল প্রকৃতির হলে ভালো হয়।

(৭) **পরিবহন :** নির্ভরযোগ্য ও দক্ষ পরিবহন ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধাযুক্ত অঞ্চলে গম বাজারজাত করা সহজ হয়। সে-কারণে গম-সমৃদ্ধ আমেরিকার প্রেইরি অঞ্চলে, রাশিয়া-ইউক্রেনের চেরনোজেম বলয়ে রেল ও সড়ক পরিবহনের সুবন্দোবস্ত আছে। গম আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রথম সারির পণ্য, তাই বন্দরের সুযোগ থাকাও বিশেষ দরকার। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পোর্ট আর্থার, ফোর্ট উইলিয়াম, ডুলুথ, শিকাগো, নিউ অর্লিয়েন্স, সান ফ্রানসিস্‌কো ইত্যাদি বন্দর গম রপ্তানির জন্য প্রসিদ্ধ। কানাডার মন্ট্রিয়েল ও ভ্যাঙ্কুভার বা ইউক্রেনের ওডেসা গম রপ্তানির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে।

০৫ গম উৎপাদনকারী প্রধান অঞ্চলগুলির ভৌগোলিক বণ্টন *(Geographical Distribution of Major Wheat Producing Areas)*

পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে জলবায়ু ও মৃত্তিকার প্রত্যক্ষ সাহচর্যে, ব্যাপকভাবে গম চাষ করা হয়। ৩৫°–৫৫° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যবর্তী এলাকা হল পৃথিবীর প্রধান (principal) গম উৎপাদক এলাকা। তবে গম বিভিন্ন জলবায়ুতে দ্রুত অভিযোজিত (adapted) হতে পারে বলে ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে গমের চাষ ব্যাপকভাবে করা সম্ভত হয়। জুলাই মাসের ১৫·৫° সে. সমোষ্ণ রেখাকে উত্তর গোলার্ধে গম চাষের উত্তর সীমারেখা (northern limit) হিসেবে ধরা হয়। কার্যত উষ্ণ-আর্দ্র ও উষ্ণ-শুষ্ক অঞ্চলে জলসেচের সাহায্যে গম চাষ করা যায়। **ফ্রায়ার** (১৯৬৫)-এর মত অনুসারে, পৃথিবীর গম উৎপাদক অঞ্চলগুলির সঙ্গে চার ধরনের কৃষির নিবিড় সংযোগ রয়েছে, যেমন —

(১) বাণিজ্যভিত্তিক ব্যাপক কৃষিব্যবস্থা;

(২) বাণিজ্যভিত্তিক শস্য ও পশুচারণ ব্যবস্থা;

(৩) বাজারকেন্দ্রিক শাক-সবজি, ফল ও শস্য উৎপাদন ব্যবস্থা;

(৪) প্রগাঢ় শুষ্ক কৃষিব্যবস্থা।

জনঘনত্ব অনুসারে পৃথিবীর গম উৎপাদক অঞ্চলগুলিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন —

(১) ঘন বসতিযুক্ত অঞ্চলের গম উৎপাদক এলাকা, যেমন — ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, হল্যান্ড, চিন, ভারত, পাকিস্তান, ইরান, তুরস্ক, ইউক্রেন ইত্যাদি (চিত্র ১২.১)।

(২) মধ্যম ও বিরল বসতিযুক্ত অঞ্চলের গম উৎপাদক এলাকা, যেমন — রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইউক্রেন, সুইডেন ইত্যাদি (চিত্র ১২.১)।

সারণি ১২.১ : পৃথিবীর গম উৎপাদন — ২০১৫

দেশ	উৎপাদন (কোটি মে. টন)	দেশ	উৎপাদন (কোটি মে. টন)
ইউরোপীয় ইউনিয়ন	১৬·০০	ইউক্রেন	২·৬৫
চিন	১৩·০০	পাকিস্তান	২·৫৫
ভারত	৮·৬৫	অস্ট্রেলিয়া	২·৪২
রাশিয়া	৬·১৮	তুরস্ক	২·২৬
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৫.৫৮	কাজাকস্তান	১·৩৭
কানাডা	২·৭৬	আর্জেন্টিনা	১·১৩
		পৃথিবী (মোট)	৭৫.৪১

[উৎস : faostat.fao.org]

অঞ্চল	বর্ণনা
উত্তর-পূর্বাঞ্চল	পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, মণিপুর, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, মিজোরাম, অরুণাচলপ্রদেশ, সিকিম।
মধ্যাঞ্চল	মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, গুজরাট, দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশের বুন্দেলখণ্ড অঞ্চল, মহারাষ্ট্রের উত্তর অংশ।
দক্ষিণাঞ্চল	মহারাষ্ট্রের দক্ষিণ অংশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, কর্নাটক, তামিলনাড়ু।
উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল	কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাঞ্চল, উত্তরপ্রদেশ, অসম, সিকিমের পার্বত্য অংশ।

■ **উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল :** ভারতের উত্তর-পশ্চিমের প্রদেশগুলি গম উৎপাদনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। কার্যত দেশের সবুজ বিপ্লব (green revolution) সার্থক করার ক্ষেত্রে গম উৎপাদক পাঞ্জাব, হরিয়ানা, জম্মু, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য (চিত্র ১২.৩)। এই অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(১) শীতকালীন গমের প্রাধান্য। ট্রিটিকাম ইস্টিভাম প্রজাতির গম সবচেয়ে বেশি পরিমাণে চাষ করা হয়।

(২) এ অঞ্চলের গমক্ষেত্রগুলির অধিকাংশই সেচসেবিত। ভাকরা-নাঙ্গাল ও সংলগ্ন নদী-প্রকল্পগুলি নির্ভরযোগ্য উৎপাদনের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

(৩) অক্টোবর-নভেম্বর মাসে গম বপন করা হয় ও এপ্রিল-মে মাসের মধ্যে শস্য সংগৃহীত হয়।

(৪) দেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে "খরিফ" মরশুমে ধান উৎপাদিত হওয়ার পরই গমের চাষ শুরু হয়। সাধারণত ধান-গম বা ধান-ডাল-গম জাতীয় শস্যাবর্তন বা শস্য সমন্বয় (Crop rotation or Crop combination) এ-অঞ্চলের কৃষির এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

(৫) ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের হিসাব অনুসারে[১], দেশের প্রথম পাঁচটি গম উৎপাদক রাজ্যের মধ্যে তিনটি রাজ্য অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

■ **উত্তর-পূর্বাঞ্চল :** ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলি গম উৎপাদনে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা ও উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গমক্ষেত্রগুলির মুখ্য বৈশিষ্ট্য হল—

(১) শীতকালীন গমের প্রাধান্য। তবে খরিফ মরশুমে ধানের সামান্য বিলম্বিত চাষের জন্য নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের আগে গম বপন করা যায় না। বপনের কাজ চলে ডিসেম্বরের প্রথমার্ধ পর্যন্ত। মার্চ-এপ্রিল মাসে ফসল সংগ্রহ করা হয়।

(২) দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মতো উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সেচসেবিত গম- জমির পরিমাণ ব্যাপক নয়।

(৩) এখানে রবিশস্য হিসেবে বা "বোরো" ধানের পাশাপাশি গম চাষ করা হয়।

(৪) ট্রিটিকাম প্রজাতির গম সবচেয়ে বেশি পরিমাণে উৎপাদিত হয়।

(৫) ধান-গম-পাট বা আখ-গম বা ধান- ডাল-মটর-গম জাতীয় শস্যাবর্তন এ অঞ্চলের এক উল্লেখযোগ্য কৃষি - বৈশিষ্ট্য। এর ফলে স্বাভাবিক ভাবে মাটির উর্বরতা বজায় রাখা যায়।

■ **মধ্যাঞ্চল :** ভারতের মধ্যাঞ্চলের রাজ্যগুলি গম উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, গুজরাট, মহারাষ্ট্রের উত্তরাংশ, দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশের বুন্দেলখণ্ড অঞ্চল ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলি মধ্যাঞ্চলের অন্তর্গত। এই এলাকার মুখ্য কৃষিবৈশিষ্ট্যগুলি হল—

[১] *Reserve Bank of India, Handbook of Statistics on the Indian Economy.*

(১) শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ জমি বৃষ্টিনির্ভর। সেচ-পরিসেবার সুযোগ প্রয়োজনের তুলনায় কম হওয়ার জন্য, শস্যহানির আশঙ্কা থাকে।

(২) মাটির আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে বীজ বপনের সময় নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহের মধ্যে বপনের কাজ শেষ করা হয়। শস্য সংগ্রহ করা হয় ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে। শীতকালীন গম চাষের প্রচলন লক্ষণীয়।

(৩) ট্রিটিকাম ডিউরাম প্রজাতির গমের চাষ এখানে অত্যন্ত জনপ্রিয়। গুজরাটের কয়েকটি অঞ্চলে অবশ্য ট্রিটিকাম ডাইকক্কাম শ্রেণির গম চাষ করা হয়।

(৪) জোয়ার-বাজরা-গম জাতীয় শস্যাবর্তন এ-অঞ্চলের কৃষির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

■ **দক্ষিণাঞ্চল :** অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলঙ্গানা, কর্নাটক, তামিলনাড়ু ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের গমক্ষেত্রগুলি দেশের দক্ষিণাঞ্চলের অন্তর্গত। আলোচ্য এলাকার মুখ্য কৃষিবৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(১) দেশের দক্ষিণাঞ্চলে গম চাষের জন্য সবচেয়ে কম সময় লাগে। বর্ষার শেষ দিকে অক্টোবর মাসের মধ্যেই গম বপনের কাজ শেষ করা হয় এবং ফসল তোলার কাজ শেষ হয় ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি নাগাদ। দক্ষিণের সেচ-সেবিত অঞ্চলে নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত বপনের কাজ চলে।

(২) বৃষ্টিনির্ভর কৃষিব্যবস্থায় উৎপাদনের তারতম্যজনিত ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। তবে সেচসেবিত এলাকায় হেক্টর প্রতি গমের উৎপাদন দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মতোই ব্যাপক। সুতরাং, সেচ-পরিসেবার উন্নতি হলে এ-অঞ্চলে গম দ্বিতীয় প্রধান বাণিজ্যিক ফসল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

(৩) ট্রিটিকাম ডিউরাম প্রজাতির গম দক্ষিণাঞ্চলে অধিক প্রচলিত। তবে ইস্টিভাম ও ডাইকক্কাম শ্রেণির গমও চাষ করা হয়।

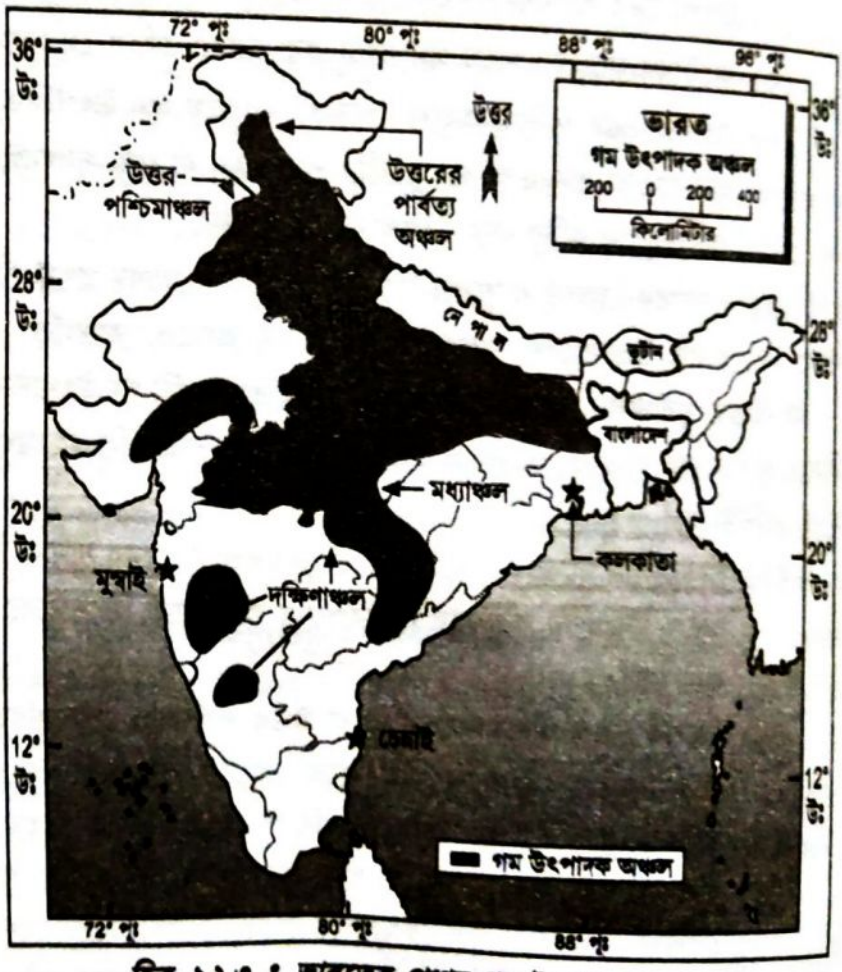

চিত্র ১২.৩ : ভারতের প্রধান গম উৎপাদক অঞ্চল

■ **উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল :** কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, অসম ও সিকিমের হিমালয় সন্নিহিত পাহাড়ি এলাকা এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। দীর্ঘ শীতের ঋতু এখানে গম চাষের সময়টিকে সুদীর্ঘ করেছে। অক্টোবর মাসে বপন ও মে-জুন মাসে গম সংগৃহীত হয়। ভূ-প্রাকৃতিক বন্ধুরতা ও অনুর্বর মাটির জন্য সাধারণত ৩,৬৬০ মিটার উচ্চতার উপরে গম চাষ করা যায় না। পর্বতের সানুদেশে উপত্যকা অঞ্চলে বাসন্তিক গম চাষ করা হয়। সেক্ষেত্রে এপ্রিল-মে মাসে বপন ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ফসল তোলার কাজ সমাপ্ত হয়। উত্তর ভারতের সমতল এলাকার মতোই এখানে ইস্টিভাম প্রজাতির গম বহুল প্রচলিত।

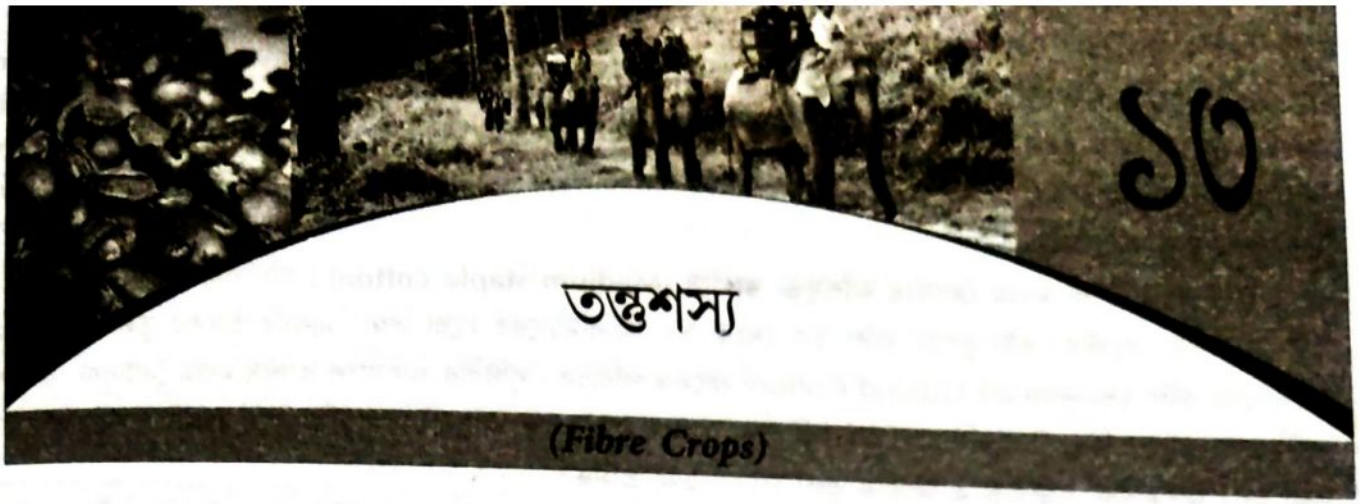

১৩ তন্তুশস্য

(Fibre Crops)

১৩.০১ কার্পাস বা তুলা (Cotton)

বিশ্বের ক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে উৎপাদিত বাণিজ্যসফল এবং অর্থকরী তন্তুশস্যগুলির মধ্যে তুলা অন্যতম। কার্পাস ও শিমুল — এই দুই ধরনের গাছ হতে তুলা সংগ্রহ করা যায়। শিমুল তুলার ব্যবহারিক গুণ কম। বিপরীতভাবে, বস্ত্র উৎপাদনের জন্য কার্পাস তুলা অর্থনৈতিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল। কার্পাসের বিজ্ঞানসম্মত নাম **গসিপিয়াম** (*Gossypium*) এবং শিমুল **"বমব্যাক্স সিবা"** (*Bombax ceiba*) নামে পরিচিত। বর্তমান আলোচনায় তুলা বলতে কার্পাসকে বোঝান হয়েছে।

০১ তুলার গুরুত্ব ও ব্যবহার (*Importance and Uses of Cotton*)

তুলা বিশুদ্ধ শ্রেণির কাঁচামাল (pure raw material)। অর্থাৎ বয়নশিল্পের উপাদান হিসেবে ১ টন তুলা থেকে সমপরিমাণ কার্পাসবস্ত্র উৎপাদন করা যায়। ফলে অন্যান্য ভারহ্রাসমান (weight-loosing) শ্রেণির কাঁচামাল, যেমন — লোহা, বক্সাইট ইত্যাদির মতো কার্পাস-বয়নশিল্পের অবস্থান (location), কাঁচামাল-কেন্দ্রিক (raw material oriented) নয়। শিল্পের ভৌগোলিক বণ্টনের ক্ষেত্রে তুলার এই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের সর্বাধিক মানুষের বস্ত্র ও পোশাক তৈরির জন্য তুলা একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এ ছাড়া, শতরঞ্চি, লেপ, তোশক, বালিশ প্রভৃতি ঘর-গৃহস্থালির দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসগুলি তুলা থেকে প্রস্তুত করা হয়। কার্পাসের বীজ থেকে তেল, সার, পশুখাদ্য আহরণ করা যায়।

ঐতিহাসিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে তুলা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। চিন, ভারত, বাংলাদেশ, মিশর প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থানগুলিতে উৎপাদিত তুলাজাত সূক্ষ্মবস্ত্র বিশ্বের বাজারে একদা অতি-আকাঙ্ক্ষিত বস্তু ছিল। অর্থাৎ পাশ্চাতের দেশগুলিতে প্রাচ্যের বস্ত্র তুলাজাত বস্ত্র বিক্রি হত। বিশ্ব-বাণিজ্যের এই ধারাটি এখনও প্রায় অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে তুলা উৎপাদন করে প্রধানত উন্নয়নশীল দেশ এবং তুলাজাত দ্রব্য আমদানি করে উন্নত বিশ্বের দেশগুলি।

পেট্রো-রসায়ন শিল্পের বিকাশের সাথে সাথে কৃত্রিম তন্তু উৎপাদন যত বৃদ্ধি পেয়েছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তুলা ততই অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছে। তবে বস্ত্র উৎপাদনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে তুলা ও কৃত্রিম তন্তুর পরিপূরক বৈশিষ্ট্য বয়নশিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে। অর্থকরী ফসলের চরিত্র অনুযায়ী, বিশ্বের বাজারে তুলার দর ওঠানামা করে।

০২ তুলার শ্রেণিবিভাগ (*Classification of Cotton*)

কার্পাস গাছের গুটিফল থেকে যে-তুলা পাওয়া যায়, আঁশের দৈর্ঘ্য অনুসারে ওই তুলা তিন ভাগে বিভক্ত, যেমন—

(১) দীর্ঘ আঁশযুক্ত কার্পাস (Long staple cotton) : **গসিপিয়াম বারবাডেন্‌স** প্রজাতির কার্পাস দীর্ঘ আঁশযুক্ত। এই শ্রেণির কার্পাসের দৈর্ঘ্য ২৫·৪ থেকে ৬৩ মিলিমিটারের মধ্যে। এ-জাতীয় তুলা সাগর দ্বীপীয় কার্পাস (Sea Island Cotton) নামেও পরিচিত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে জর্জিয়া, ফ্লোরিডার নিকটবর্তী দ্বীপসমূহ, বাহামা এবং সন্নিহিত অঞ্চল এই শ্রেণির তুলার আদি ভূমি। তাই তুলাকে সাগর দ্বীপীয় তুলা বলা হয়। বল উইভিল (Bol Weevil) পোকার আক্রমণে দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলার চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মিশর, হাইতি, ডোমিনিকান রিপাবলিক ইত্যাদি দেশ দীর্ঘ আঁশের উৎকৃষ্ট তুলা উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ।

(২) মাঝারি বা মধ্যম দৈর্ঘ্যের আঁশযুক্ত কার্পাস (Medium staple cotton) : **গসিপিয়াম হিরসুটাম** প্রজাতির কার্পাস মধ্যম দৈর্ঘ্যের। এই তুলার আঁশ ১৩ থেকে ৪০ মিলিমিটারের মধ্যে লম্বা। মাঝারি আঁশের তুলা আমেরিকান আপল্যান্ড কটন (American Upland Cotton) নামেও পরিচিত। পৃথিবীর অধিকাংশ কার্পাস মধ্যম দৈর্ঘ্যযুক্ত। ব্রাজিল, পাকিস্তান, ভারত, চিন, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, কাজাখস্তান, পেরু, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশে মাঝারি দৈর্ঘ্যের তুলা চাষ করা হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এ-জাতীয় তুলা চাষের জন্য প্রসিদ্ধ।

(৩) হ্রস্ব আঁশযুক্ত তুলা (Short staple cotton) : খসখসে অনুজ্জ্বল ছোটো আঁশের তুলা উৎপাদনে চিন ও ভারত প্রসিদ্ধ। সাধারণত ৯·৫ মি.মি. থেকে ২৫·৪ মি.মি.-র মধ্যে এ-জাতীয় তুলার দৈর্ঘ্য সীমাবদ্ধ থাকে। হ্রস্ব আঁশের তুলা এককভাবে উৎকৃষ্ট বস্ত্র উৎপাদনের অনুপযোগী। একে মাঝারি ও দীর্ঘ আঁশের তুলার সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়।

০৩ ভৌগোলিক পরিবেশ *(Geographical Conditions)*

(১) উষ্ণতা : ক্রান্তীয়, উপক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু তুলাচাষের উপযোগী। উষ্ণ আবহাওয়া ও পর্যাপ্ত সূর্যকিরণ তুলা উৎপাদনের পক্ষে আদর্শ। বস্তুত, তুলাচাষে জলবায়ুর গুরুত্ব বেশি। বাৎসরিক গড় উষ্ণতা ২০° সে.–২৭° সে. এই চাষের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। তুলা গাছের প্রাথমিক অবস্থায় ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা ও পরিণত গাছের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান তাপমাত্রা দরকার হয়।

(২) তুহিন : অত্যধিক শৈত্য ও তুহিন তুলা চাষের ক্ষতি করে। তুলা উৎপাদন সুনিশ্চিত করার জন্য অন্তত ২০০টি তুহিনমুক্ত (frost-free) দিন আবশ্যক।

(৩) বৃষ্টিপাত : হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে তুলা চাষ করা যায়। সাধারণত ৫০–১০০ সেমি. বাৎসরিক বৃষ্টিপাত তুলা চাষের জন্য জরুরি। তবে ৫০ সেমি. বা তার কম বৃষ্টিতে জলসেচের প্রয়োজন হয়। অঙ্কুরোদ্‌গম ও কার্পাস গাছের প্রাথমিক অবস্থায় বৃষ্টিপাত দরকার।

(৪) শুষ্ক আবহাওয়া : তুলা সংগ্রহের সময় শুষ্ক আবহাওয়া প্রয়োজন।

(৫) মৃত্তিকা : উত্তম জলনিকাশি বন্দোবস্তযুক্ত উর্বর, লবণাক্ত, হালকা, চুনমিশ্রিত দো-আঁশ মাটিতে কার্পাস গাছ জন্মায়। জলমগ্ন জমিতে তুলা চাষ করা যায় না। শুষ্ক কৃষির ফসল (dry crop) হিসেবে কৃষ্ণ-কার্পাস মাটি (black cotton soil) ও সেচসেবিত ফসল (irrigated crop)-রূপে পললমাটি (alluvial soil) তুলা চাষের উপযোগী।

(৬) জমি : জলমগ্ন হয় না এমন সমতল বা অল্প ঢালুজমি কার্পাস চাষের উপযোগী। নীচু জমি হলে নালি কেটে অতিরিক্ত জল নিষ্কাশনের বন্দোবস্ত করা দরকার।

(৭) সার : বৃষ্টি সেবিত অঞ্চলে প্রতি হেক্টরে ২০–১০০ কেজি নাইট্রোজেন সার আবশ্যক। তবে সেচসেবিত অঞ্চলে হেক্টর প্রতি নাইট্রোজেন সার ৪০–৬০ কেজির মতো দরকার হয়।

(৮) শ্রমিক : আগাছামুক্ত রাখা, সার দেওয়া, রোগপোকার আক্রমণ দমন করা, জলসেচের বন্দোবস্ত করা ইত্যাদি কাজ শ্রমনিবিড় (labour intensive)। সে-কারণে তুলাচাষে শ্রমিকের সংখ্যা বেশি হয়।

(৯) পরিবহন : তুলা বিশুদ্ধ শ্রেণির কাঁচামাল বলে বিশ্বের যে-কোনো জায়গায় অবস্থিত সুতা বা কাপড় কলে একে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা যায়। সে-জন্য দক্ষ পরিবহন ব্যবস্থা বিশেষ জরুরি।

এ ছাড়া, ক্রয়ক্ষমতাসম্পন্ন বাজার, মূলধন, কৃষি-প্রযুক্তি, সরকারি নীতি প্রভৃতি তুলা চাষে নতুন মাত্রা যুক্ত করে।

দেশের দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলে উষ্ণ শুষ্ক পরিবেশে উৎকৃষ্টমানের তুলা উৎপাদিত হলেও কার্পাসবয়নশিল্প অন্য তিনটি অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে। যেমন —

(১) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম কার্পাসবয়নশিল্প গড়ে ওঠে আটলান্টিক উপকূলবর্তী নিউ ইংল্যান্ড অঞ্চলে (বর্তমানের ম্যাসাচুসেটস ও রোড আইল্যান্ড প্রদেশ)। এই অঞ্চলটি তুলা বলয়ের বাইরে এবং বাজারভিত্তিক বস্ত্রবয়ন কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধ।

(২) মধ্য আটলান্টিক অঞ্চলের কার্পাস-বয়নশিল্প, নিউ ইংল্যান্ড অঞ্চলের মতোই বাজারনির্ভর ও মূল তুলা বলয়ের বাইরে অবস্থিত।

(৩) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ-পূর্বে ক্যারোলিনা ও সংলগ্ন প্রদেশগুলিতে অবস্থিত বয়নশিল্প তুলা উৎপাদক অঞ্চলের কাছে অবস্থিত এবং এখানে আধুনিক শিল্প-পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা আছে।

প্রসঙ্গত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অভ্যন্তরীণ চাহিদার অতিরিক্ত কার্পাস-তুলা উৎপাদিত হয়। ফলে যুক্তরাষ্ট্র কার্পাস রপ্তানিকারক দেশ।

■ **ভারত :** তুলা ভারতের অন্যতম অর্থকরী বাণিজ্যসফল তন্তুশস্য। দেশের তুলা উৎপাদক জমির প্রায় অর্ধেক **গসিপিয়াস হিরসুটাম** প্রজাতির মধ্যম দৈর্ঘ্যের আঁশযুক্ত কার্পাস উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়। **গসিপিয়াম বারবাডেনস** প্রজাতির দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলার উৎপাদন ভারতে মাত্র কয়েক হাজার হেক্টর জমির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

■ ভারতে তুলাচাষের বণ্টন (Distribution of Cotton Cultivation in India)

দেশের প্রধান তুলা উৎপাদক অঞ্চল মূলত ৮০° পূর্ব দ্রাঘিমার পশ্চিমে অবস্থিত। ভারতের তুলা বলয়কে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন — (১) পশ্চিমাঞ্চল, (২) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, (৩) মধ্যাঞ্চল ও (৪) দক্ষিণাঞ্চল (চিত্র ১৩.৩)।

(১) পশ্চিমাঞ্চল : গুজরাটের দো-আঁশ ও লাল-বেলে দো-আঁশ মাটি কার্পাস উৎপাদনের উপযুক্ত। এখানে খরিফ মরশুমে তুলা চাষ করা হয়। সাধারণত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ শুরু হওয়ার আগে অর্থাৎ বর্ষার প্রারম্ভে বপনের কাজ শেষ করা হয়।

(২) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল : পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ ও পূর্ব রাজস্থান ভারতের উত্তর-পশ্চিম তুলা বলয়ের অন্তর্গত। এখানে কার্পাস প্রধানত খরিফ মরশুমের ফসল। সেচসেবিত এলাকায় মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে ও বৃষ্টিনির্ভর অঞ্চলে জুন-জুলাই মাসে বীজ বপন করা হয়। দেশের উত্তর- পশ্চিমাঞ্চলের পলল মৃত্তিকা কার্পাস চাষের উপযুক্ত। সেচনির্ভর এলাকায় তুলার সঙ্গে গম ও জোয়ার একসাথে চাষ করা হয়। ফলে চাষের খরচ ও জলের ব্যবহার কমে। মোট কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। তুলাচাষের আগে একই জমিতে বহুক্ষেত্রেই মটরশুঁটি, বাদাম ইত্যাদি চাষ করার জন্য জমি নাইট্রোজেন-সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

চিত্র ১৩.৩ : ভারতের তুলা উৎপাদক অঞ্চল

(৩) মধ্যাঞ্চল : মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের কৃষ্ণ- কার্পাস মাটি ও লাল দো-আঁশ মাটি তুলা চাষের উপযোগী। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো তুলা এখানে খরিফ শস্য হিসেবে চাষ করা হয়। এখানে তুলার রুগ্ন চারাগাছ নষ্ট করে ফেলার (thinning) চল রয়েছে।

(৪) দক্ষিণাঞ্চল : তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু অংশ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের তুলা বলয়ের অন্তর্গত। কৃষ্ণ- কার্পাস মাটি, দো-আঁশ ও লাল দো-আঁশ মাটি, ল্যাটেরাইট মাটিতে প্রচুর তুলা উৎপাদিত হয়। তামিলনাড়ুতে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে এবং কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশ-তেলঙ্গানার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বীজ বপন করা হয়। এ ছাড়া, ধারওয়ার ও সন্নিহিত অঞ্চলে এবং তামিলনাড়ুর কিছু কিছু জায়গায় ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাসের মধ্যে বীজবপনের চল আছে। দাক্ষিণাত্যের সেচসেবিত ও বারিনির্ভর এলাকায় রাগি, জোয়ার, বাজরা, বাদাম ইত্যাদি শস্যের সঙ্গে তুলা চাষ করা হয়।

সারণি ১৩.২ : ভারতের তুলা উৎপাদক অঞ্চল

অঞ্চল	বণ্টন
পশ্চিমাঞ্চল	**গুজরাট** (আমেদাবাদ, সুরাট, বদোদরা, ভারুচ, খেদা, মহেশনা, আমরেলি, সুরেন্দ্রনগর ইত্যাদি জেলা)।
উত্তর পশ্চিমাঞ্চল	**পাঞ্জাব** (লুধিয়ানা, গুরদাসপুর, ফরিদকোট, হোসিয়ারপুর, অমৃতসর, ভাটিন্ডা, জলন্ধর প্রভৃতি জেলা)। **হরিয়ানা** (ঝিন্দ, রোটক, সিরসা, হিসার, গুরগাঁও, আম্বালা, ভিওয়ানি ইত্যাদি জেলা)। **পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ** (মীরাট, সাহারানপুর, বুলন্দশর, মুজঃফরনগর, বিজনোর, মোরদাবাদ, ফতেগড়, গাজিয়াবাদ প্রভৃতি জেলা)। **রাজস্থান** (কোটা, টংক, আলওয়ার, ভিলওয়াড়া, চিতোরগড় ইত্যাদি জেলা)।
মধ্যাঞ্চল	**মহারাষ্ট্র** (আকোলা, নানদের, জলগাঁও, বুলদানা, শোলাপুর, ইয়াভাতমল, ওয়ার্ধা প্রভৃতি জেলা)। **মধ্যপ্রদেশ** (পূর্ব ও পশ্চিম নিমার, উজ্জয়িনী, রায়পুর, দেওয়াস, রাতলাম, শিহোর, খাণ্ডোয়া, খারগাঁও, হোসঙ্গাবাদ ইত্যাদি জেলা)।
দক্ষিণাঞ্চল	**কর্ণাটক** (চিত্রদ্রুগ, বেলগাও, গুলবর্গা, শিমোগা, বিজাপুর, চিকমাগালুর, ধারওয়ার, ইত্যাদি জেলা)। **তামিলনাড়ু** (সালেম, তিরুচিরাপল্লি, রামনাথপুরম, তিরুনেলভেলি, কোয়েমবাটুর, মাদুরাই প্রভৃতি জেলা)। **দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলঙ্গানা** (অনন্তপুর, মেহবুবনগর, কুরনুল, অনন্তপুর, চিত্তুর, আদিলাবাদ, মেডাক, মচিলিপতনম, এলুরু ইত্যাদি জেলা)।

■ ভৌগোলিক পরিবেশ (Geographical Conditions)

তুলা ক্রান্তীয় তন্তুশস্য। ভারতে প্রায় সর্বত্র খরিফ মরশুমে তুলা উৎপাদন করা হয়। মধ্যম দৈর্ঘ্যের আঁশযুক্ত তুলার উৎপাদনে ভারতের উন্নতির কারণগুলি হল—

(১) হিমালয়ের পার্বত্য এলাকা ছাড়া ভারতের প্রায় সর্বত্র জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ২০°–৩৫° সে. তাপমাত্রা থাকে, যা তুলা চাষের সহায়ক।

(২) অত্যধিক শৈত্য ও তুহিন তুলা চাষের ক্ষতি করে। ৮০° পূর্ব দ্রাঘিমার পশ্চিমে অবস্থিত ভারতের প্রধান তুলা উৎপাদক অঞ্চল তুহিন ও শৈত্যের আধিক্যমুক্ত।

(৩) সাধারণত ৫০–১০০ সেমি. বাৎসরিক বৃষ্টিপাত তুলা চাষের জন্য প্রয়োজন। বারিনির্ভর পরিবেশে ভারতের যে-সমস্ত অঞ্চলে তুলা চাষ করা হয়, সেখানে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ৫০ সেমি. বা তার বেশি। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, দক্ষিণ-পূর্ব মহারাষ্ট্র, পূর্ব কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশের অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলগুলিতে জলসেচের সাহায্যে তুলা চাষ করা হয়। ভাকরা-নাঙ্গাল, রাজস্থান খাল, মাহি, নর্মদা, কৃষ্ণা, গোদাবরী, ঘটপ্রভা, মণিমুথর, নাগার্জুনসাগর ইত্যাদি সেচ প্রকল্প ভারতে তুলানির্ভর আঞ্চলিক কৃষি-অর্থনীতির বুনিয়াদ মজবুত করেছে।

(৪) পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশের পলল মৃত্তিকা; গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশের দো-আঁশ, লাল-বেলে দো-আঁশ ও রেগুর বা কৃষ্ণ-কার্পাস মৃত্তিকা এবং তামিলনাড়ু ও কেরালার ল্যাটেরিয় মৃত্তিকা তুলা চাষের সহায় হয়েছে। বিশেষত, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম কার্বনেট-সমৃদ্ধ এবং সহায়ক খনিজে ভরপুর কৃষ্ণ-কার্পাস মৃত্তিকা (Black Cotton Soil) তুলা উৎপাদনের উপযোগী।

(৫) ভারতের পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলের তুলা উৎপাদক স্থানগুলি বন্যায় জলমগ্ন হয় না বলে তুলা চাষের সহায়ক।

(৬) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়ান ফেডারেশন, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে যন্ত্রের সাহায্যে তুলা সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে। বিপরীতভাবে, সুলভ শ্রমিকের সহায়তায় ভারত, চিন প্রভৃতি জনাকীর্ণ দেশগুলিতে তুলা চাষ এখনও শ্রমনিবিড়। ভারতের কৃষিক্ষেত্রে পূর্ণ যন্ত্রিকরণের পরিবেশ না থাকায়, সুলভ শ্রমিকের অবদান প্রচুর।

(৭) ভারতের বিভিন্ন শহর ও বাজারগুলির মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী সড়কপথ ও রেলপথ দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারগুলিতে কার্পাস ও কার্পাসজাত দ্রব্যের সরবরাহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে উত্তর, মধ্য, দক্ষিণ-মধ্য ও দক্ষিণ রেলপথ এ-কাজে পারদর্শী।

■ মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে তুলাচাষের প্রাধান্য ও সাম্প্রতিক বিবর্তন (Predominance of Cotton Cultivation in Central and South India and Recent Changes)

মধ্য ও দক্ষিণ রাজ্যগুলি ভারতে তুলাচাষের আদিভূমি। ঐতিহাসিক, প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক কারণের সম্মিলিত ফল হিসাবে মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে তুলা চাষের আঞ্চলিক প্রাধান্যকে বিশ্লেষণ করা যায়।

(১) ঐতিহাসিক পটভূমি : ১৮৬০ সাল নাগাদ তিনটি প্রধান দেশীয় ও আন্তর্দেশীয় কারণ মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের কার্পাস উৎপাদক অঞ্চলে ব্যাপক পরিবর্তনের পটভূমি রচনা করে। যেমন—

(ক) ১৮৫৩ সালে মুম্বাই ও থানে (Thane)-র মধ্যে রেল সংযোগ স্থাপিত হয়। ফলে দক্ষিণ ও মধ্য ভারতের তুলা দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজারে প্রচুর পরিমাণে আসতে থাকে।

(খ) আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ভারতীয় তুলা রপ্তানির ক্ষেত্রে লাভজনক পরিস্থিতি তৈরি করে। ফলে ১৮৬২ সালে যেখানে কার্পাস রপ্তানির মাধ্যমে মাত্র ৫·৬ কোটি টাকা উপার্জিত হয়, সেখানে ১৮৬৪—'৬৫ সালে এই পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৭·৫ কোটি টাকা।

(গ) ১৮৫১ সালে মুম্বাই অঞ্চলে কাপড় কলগুলি স্থাপিত হয় এবং কালক্রমে মুম্বাই-আমেদাবাদ সংলগ্ন এলাকা কার্পাস-বয়নশিল্পের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের শেষে ভারতীয় তুলা রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পেলেও, ততদিনে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার গড়ে উঠেছে। ফলে মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে তুলার চাষ ক্রমশ বাড়তে থাকে।

(২) প্রাকৃতিক পটভূমি :

(ক) তুলা চাষের উপযোগী জলনিকাশি বন্দোবস্তযুক্ত সামান্য ঢালসহ উঁচু জমি মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের ভূপ্রকৃতির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।

(খ) কার্পাস চাষের সহায়ক উষ্ণ ক্রান্তীয় জলবায়ু; গড়ে ২০°—৩৫° সে. উষ্ণতা; বপনকালীন উষ্ণ পরিবেশ; রৌদ্রসমুজ্জ্বল দিন; অঙ্কুরোদ্‌গম-সময়ে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত; বাৎসরিক ৫০ সেমি.-র কাছাকাছি বৃষ্টিপাত প্রভৃতি এখানে তুলা চাষের অনুকূল আবহ তৈরি করেছে।

(গ) ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ম্যাগনেশিয়াম কার্বনেট ও বিভিন্ন দ্রবণীয় লবণ-সমৃদ্ধ পলল ও কৃষ্ণ-কার্পাস মৃত্তিকা তুলা চাষের উপযুক্ত। এ-জাতীয় মৃত্তিকায় নাইট্রোজেন-এর পরিমাণ কম।

(৩) **অর্থনৈতিক পরিকাঠামো :**

(ক) মাটিতে নাইট্রোজেনের মাত্রা ঠিক রাখার জন্য এখানে শস্যাবর্তনের সুবিধা আছে। বিশেষত, কার্পাস ও মটরজাতীয় শস্য একসাথে বা আগুপিছু চাষের মাধ্যমে মাটিতে নাইট্রোজেন বৃদ্ধি করা হয়।

(খ) দাক্ষিণাত্যের তুলা বলয়ে জলসেচের সুবিধা আছে। বিশেষত তুঙ্গভদ্রা, নাগার্জুনসাগর, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, ঘটপ্রভা, মালপ্রভ, নীরা প্রভৃতি নদীসেচ প্রকল্পগুলির সাহায্যে মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৩০ শতাংশ তুলা-জমিকে জলসেচ পরিসেবার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

(গ) রেল ও সড়কপথে তুলা পরিবহনের সুযোগ আছে।

(ঘ) রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে আধুনিক কৃষি-প্রযুক্তি, কৃষিঋণ ও অন্যান্য পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়, যেমন — নিখিল ভারত কার্পাস উন্নয়ন প্রকল্পের (All India Co-ordinated Cotton Improvement Project) অধীনে উন্নতমানের কার্পাসবীজ তুলাচাষিদের দেওয়া সম্ভব হয়েছে। যথা — কর্ণাটকের তুঙ্গভদ্রা প্রকল্প অঞ্চলের জন্য "বরলক্ষ্মী", তামিলনাড়ুর সেচসেবিত অঞ্চলের উপযোগী "MCU-5" ও "সুজাতা", অন্ধ্রপ্রদেশে ও তেলঙ্গানায় ধান কাটার পর বপনের উপযোগী "কৃষ্ণা" নামক তুলা বীজ ইত্যাদি।

তবে দেশে তুলা চাষের অগ্রগতির সাথে সাথে মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি তুলা উৎপাদনে প্রাধান্য হারিয়েছে। হরিয়ানা, রাজস্থান ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের বিস্তীর্ণ সেচসেবিত অঞ্চলে অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের সহায়তায় তুলা চাষ সম্প্রসারিত হয়েছে।

■ ভারতে তুলার বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতি (Trends of Cotton Trade in India)

ভারত তুলা ও তুলাজাত বস্ত্র রপ্তানি করে। উৎকৃষ্ট মানের বস্ত্রসম্ভারের জন্য ভারতকে দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা আমদানি করতে হয়। ভবিষ্যতে হেক্টর প্রতি কার্পাসের ফলন-হার বাড়ানো সম্ভব হলে ভারত তুলার রপ্তানি বাণিজ্যে আরও ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণে সমর্থ হবে। ২০১৩ সালের হিসাব অনুযায়ী ভারতের মোট তুলা আমদানির পরিমাণ হল ১·৭২ লক্ষ টন। বিপরীতভাবে, মোট তুলা রপ্তানির পরিমাণ হল ২৩·৬৮ লক্ষ টন। ভারত বর্তমানে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম জামাকাপড় ও বস্ত্র রপ্তানিকারক দেশ। এই কাজে ভারত ইটালি ও বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভারত থেকে সবচেয়ে বেশি বস্ত্র সামগ্রী আমদানি করে।

০৫ তুলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য *(International Trade of Cotton)*

কার্পাস বাণিজ্যভিত্তিক অর্থকরী ফসল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ব্রাজিল, উজবেকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ আন্তর্জাতিক বাজারে তুলা রপ্তানি করে। এ ছাড়া, নিকারাগুয়া, তুরস্ক, মেক্সিকো ইত্যাদি দেশগুলিও সামান্য পরিমাণে রপ্তানি-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে। তুলা আমদানিকারক দেশ হিসেবে চিন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইতালি, হংকং, ভারত, জার্মানি, পোর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স, রুমানিয়া অন্যতম।

সারণি ১৩.৩ : তুলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য — ২০১৩ (লক্ষ টন)

আমদানি		রপ্তানি	
দেশ	পরিমাণ	দেশ	পরিমাণ
চিন	৪১·৪৭	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	২৭·৮৯
তুরস্ক	৮·৬৯	ভারত	২৩·৬৮
ইন্দোনেশিয়া	৬·৭২	অস্ট্রেলিয়া	১১·৭৩
বাংলাদেশ	৫·৭৩	ব্রাজিল	৫·৭৩
ভারত	১·৭২	উজবেকিস্তান	৩·০৯

[উৎস : faostat. fao.org]

০৬ তুলা চাষের সমস্যা (Problems of Cotton Cultivation)

তুলা চাষের প্রধান সমস্যা হল —

(১) রোগ-পোকার আক্রমণ তুলা উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। বল উইভিল, অ্যাফাইড, থ্রিপ, লিফ-ওয়র্ম জাতীয় পোকার আক্রমণে কার্পাস উৎপাদন প্রচণ্ড ব্যাহত হয়।

(২) পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশগুলিতে অনুন্নত জলসেচ ও পরিবহন ব্যবস্থার অভাবের জন্য উৎপাদিত তুলার বাজারজাতকরণ বিঘ্নিত হয়।

(৩) অত্যধিক উৎপাদনের জন্য বহুক্ষেত্রেই তুলার দাম এত কমে যায় যে, কৃষক ফসলের দাম পায় না।

(৪) পৃথিবীর কয়েকটি শিল্পোন্নত দেশ ছাড়া তুলার চাষ সর্বত্র শ্রমনিবিড়। ফলে উৎপাদন খরচ বেশি।

(৫) পেট্রো-রসায়ন ও কয়লা-রসায়ন শিল্প থেকে যে কৃত্রিম তন্তু পাওয়া যায়, তার পরিমাণ বেশি ও দামে সস্তা। তাই তুলা ও কৃত্রিম তন্তু অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছে।

সারণি ১৩.৪ : পৃথিবীর প্রধান তুলা উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলির বণ্টন ও বৈশিষ্ট্য

মহাদেশ	দেশ	মুখ্য তুলা উৎপাদক অঞ্চল / রাজ্য	বাণিজ্যের প্রকৃতি
এশিয়া	চিন	ইয়াংসি-সিকিয়াং নদী অববাহিকা; লোয়েশ মৃত্তিকা অঞ্চল; পূর্ব চিনের সমভূমি।	আমদানিকারক দেশ, রপ্তানির পরিমাণ অল্প।
	ভারত	পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ এবং গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্নাটক-সহ দক্ষিণ-ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল।	মধ্যম দৈর্ঘ্যের তুলা রপ্তানি ও দীর্ঘ আঁশ-যুক্ত তুলা আমদানি করা হয়।
	পাকিস্তান	সিন্ধু উপত্যকার উর্বর সমভূমি অঞ্চল; ভাওয়ালপুর, শাহিওয়াল মুলতান, ফয়জলাবাদ প্রভৃতি কেন্দ্র তুলা উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ।	রপ্তানিকারক দেশ।
	তুরস্ক	কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগর উপকূলবর্তী সমভূমি।	রপ্তানিকারক দেশ।
	উজবেকিস্তান	আমুদরিয়া উপত্যকা ও সংলগ্ন সেচসেবিত অঞ্চল।	রপ্তানিকারক দেশ।
উত্তর আমেরিকা	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	টেকসাস, জর্জিয়া, আলাবামা, মিসিসিপি, নিউ মেক্সিকো, অ্যারিজোনা, ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশ।	রপ্তানিকারক দেশ।
দক্ষিণ আমেরিকা	ব্রাজিল	কাস্পিয়ান ও ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী অঞ্চল।	রপ্তানিকারক দেশ।
আফ্রিকা	মিশর	নীলনদ উপত্যকার সেচসেবিত অঞ্চল	রপ্তানিকারক দেশ।
ইউরোপ	গ্রিস	বিক্ষিপ্ত নদীগঠিত ও উপকূলবর্তী সমভূমি	রপ্তানিকারক দেশ।
ওশানিয়া	অস্ট্রেলিয়া	মারে-ডার্লিং নদী অববাহিকা ও দক্ষিণ-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার উপকূলবর্তী সমভূমি	রপ্তানিকারক দেশ।

০৭.০২ পাট (Jute)

পাট একটি অর্থকরী ও বাণিজ্যিক তন্তুশস্য। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের দেশগুলিতে পাট চাষ করা হয়। পাট বল্কলজাত তন্তু ও পৃথিবীর সব ধরনের তন্তুশস্যের মধ্যে পাট সুলভ ও সস্তা। পাটগাছের বৈজ্ঞানিক

ইক্ষু (Sugarcane)

ইক্ষু ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল। ইক্ষুর বৈজ্ঞানিক নাম Saccharum Officinarum. ইক্ষুর রস থেকে চিনি, গুড়, অ্যালকোহল ইত্যাদি তৈরী হয়। ইক্ষুর ছিবড়ে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হত তবে বর্তমানে এই ছিবড়ে কাগজ তৈরীর কাজেও ব্যবহার করা হয়।

ইক্ষু চাষের অনুকূল অবস্থা (Favourable Conditions of Growth) : ইক্ষু পরিপক্ক হতে সাধারণত 10–15 মাস সময় লাগে তবে অনেক সময় 18 মাস সময়ও লাগে।

জলবায়ু (Climate) : ইক্ষু উষ্ণমন্ডলের ফসল।

উষ্ণতা (Temperature) : ইক্ষু চাষের জন্য প্রয়োজন 21°–27° সেলসিয়াস উত্তাপের। এর চেয়ে বেশী উত্তাপ গাছের যেমন ক্ষতি করে তেমনি এর চেয়ে কম উত্তাপ গাছের পক্ষে ক্ষতিকর।

বৃষ্টিপাত (Rainfall) : ইক্ষু চাষের জন্য 75–150 সে.মি. বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। বৃষ্টিপাত কম হলে জলসেচের প্রয়োজন, তবে অধিক বৃষ্টিপাত ইক্ষুর শর্করার পরিমাণ কমিয়ে দেয়। ইক্ষু পাকবার সময় অল্প সময়ের জন্য ঠান্ডা ও শুষ্ক আবহওয়ার প্রয়োজন হয়। তুহিন ইক্ষু চাষের পক্ষে ক্ষতিকর।

মৃত্তিকা (Soil) : বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকায় ইক্ষুর চাষ হলেও এই চাষের জন্য চুন ও লবণ মিশ্রিত দোআঁশ মৃত্তিকা উপযুক্ত। এছাড়া কাদাযুক্ত দোঁআশ মৃত্তিকা, কৃষ্ণকার্পাস মৃত্তিকা, বাদামী বা লালবর্ণের দোঁ-আশ মৃত্তিকা এবং ল্যাটারাইট মৃত্তিকাতে ইক্ষুর চাষ হয়। মৃত্তিকা নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম এর ফসফোরাস সমৃদ্ধ হলে এবং তার অম্লতার পরিমাণ কম হলে ইক্ষুচাষ ভাল হয়। ইক্ষু চাষ মাটির উর্বরতা শক্তি কমে যায় বলে এই চাষে সারের প্রয়োগ প্রয়োজন। সমভূমি কিম্বা মালভূমি অঞ্চলের ঢালযুক্ত হলে চাষ ভাল হয়।

শ্রমিক (Labour) : ইক্ষু রোপন হতে ফসল কাটার জন্য দক্ষ ও সুলভ শ্রমিকের প্রয়োজন। কারণ ইক্ষু চাষের সমস্ত কাজই হাতে করতে হয়।

পরিবহণ (Transport) : ইক্ষু ক্ষেত্র হতে কাঁচামাল পরিবহনের জন্য পরিবহন ব্যবস্থা সুন্দর হওয়া প্রয়োজন। কারণ ইক্ষু কাটার 24 ঘন্টার মধ্যে তার রস নিস্কাশন না করলে গাছের রসের পরিমাণ কমে যায় এই কারণে চিনি কলগুলি প্রধানত ইক্ষু চাষ ক্ষেত্রের নিকটে অবস্থিত।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing Areas) :

পৃথিবীর যে কোন দেশ অপেক্ষা ভারতে ইক্ষু চাষের জমির পরিমাণ অধিক। ইক্ষু উৎপাদনে পৃথিবীতে ব্রাজিলের পরই ভারতের স্থান। ভারতে ইক্ষুচাষের সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হল হেক্টর প্রতি উৎপাদন। ইন্দোনেশিয়া, মিশর বা মেক্সিকোতে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ভারতের তুলনায় প্রতি হেক্টরে 50% বেশী।

ভারতের ইক্ষু উৎপাদন অঞ্চলকে তিনটি প্রধান বলয়ে ভাগ করা যায়—

(i) পাঞ্জাব হতে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত শতদ্রু-গঙ্গা সমভূমি অঞ্চল। এই অঞ্চল ভারতের উৎপাদিত অঞ্চলে শতকরা 50 ভাগ জমি এবং মোট উৎপাদন শতকরা 60 ভাগ উৎপাদন করে।

(ii) মহারাষ্ট্র হতে তামিলনাড়ু পর্য্যন্ত বিস্তৃত কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চল। এই অঞ্চলটি প্রধানত পশ্চিমঘাট পর্বতের পূর্বঢালে অবস্থিত।

(iii) অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল অঞ্চল ও কৃষ্ণা নদীর উপত্যকা অঞ্চল। ভারতে ইক্ষু চাষের ক্ষেত্রে উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় যে উত্তর ভারতের চাষ দক্ষিণ ভারত অপেক্ষা কতগুলি বিশেষ কারণে ক্ষতিগ্রস্থ— গরম কালে উত্তর ভারতের তাপমাত্রা 30°–35° সেলসিয়াস ও লুনামে গরম বাতাসের প্রবাহ চলে। আবার তেমনি শীতকালে বিশেষত ডিসেম্বর—জানুয়ারী মাসে অত্যধিক ঠাণ্ডায় ও কুয়াশায় ইক্ষুর স্বাভাবিক

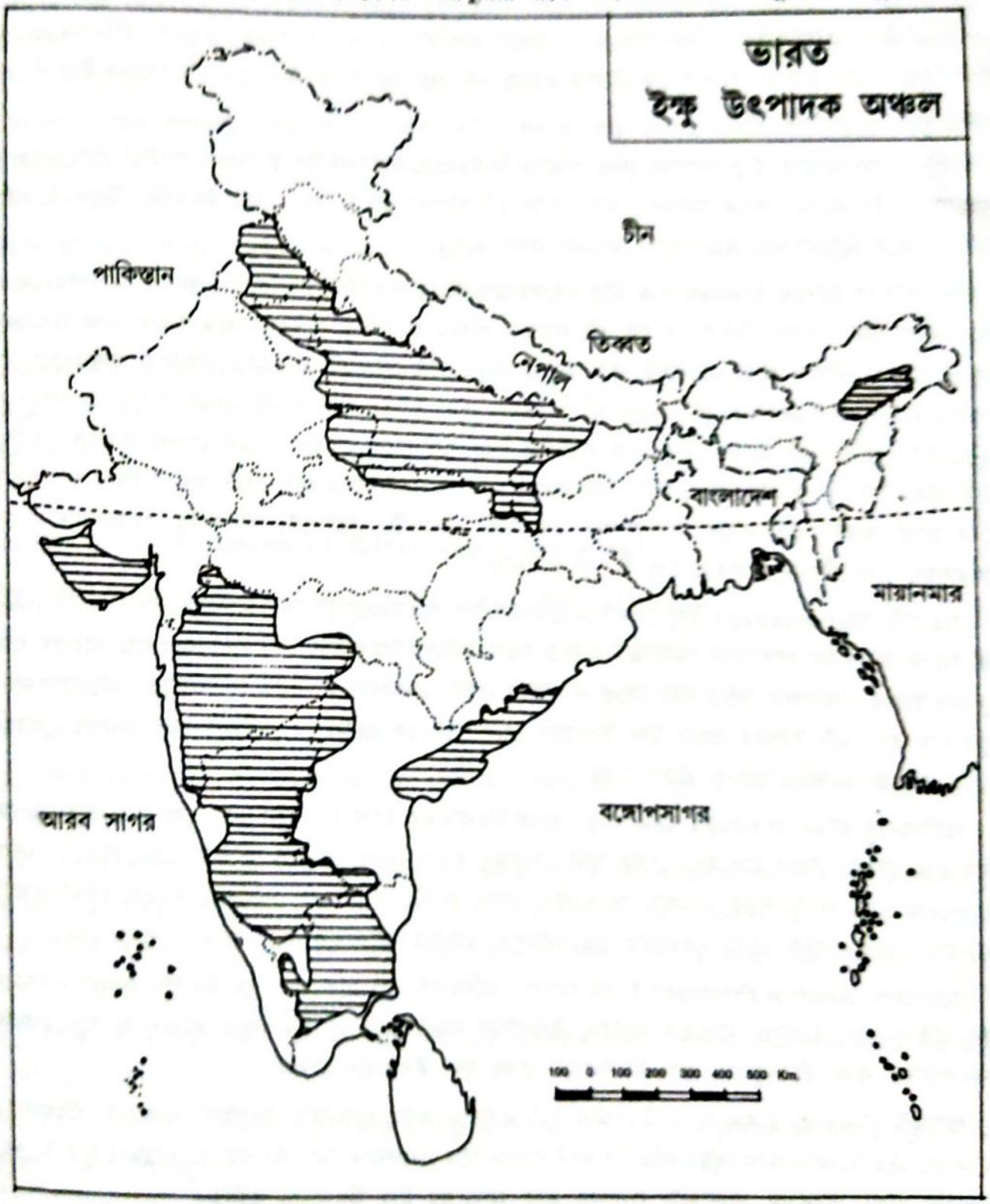

চিত্র 41 : (ভারত) ইক্ষু উৎপাদক অঞ্চল

বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতে হেক্টর প্রতি উৎপাদন অধিক গ্রীষ্মের 'লু' চলে না বা শীতকালে শীতলতাও অধিক হয় না। অন্যদিকে সমুদ্র বায়ুর প্রভাবে ইক্ষুর চারার সত্তর বৃদ্ধি ঘটে। তাই বলা যায় যে দক্ষিণ ভারত ইক্ষু চাষের উপযোগী প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় উত্তর ভারতে প্রধান ইক্ষুক্ষেত্রগুলি অবস্থিত। এর কারণ হিসেবে দুটি বিশেষ বিষয়ের উল্লেখ করা হয়—

(a) উত্তর ভারতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে নীলের চাষ হত, যা বাণিজ্যিকভাবে অনেক বেশী পছন্দের ফসল ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই নীলের বাজার নষ্ট হয়ে যায় ফলে ঐ নীল চাষের অঞ্চল ধীরে ধীরে ইক্ষু চাষের অঞ্চলে পরিণত হয়।

(b) দক্ষিণ ভারতে ইক্ষু অপেক্ষা তুলা, তামাক, চিনাবাদাম, নারকেল ইত্যাদি অধিক অর্থকরী ফসল উৎপাদিত হবার ফলে ইক্ষুচাষের ক্ষেত্রে অন্যান্য চাষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। মোট উৎপাদিত ইক্ষুর তিনভাগের দুভাগই আসে উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটক রাজ্য হতে।

উত্তরপ্রদেশ (Uttar Pradesh) : ইক্ষু উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতে উত্তরপ্রদেশের স্থান প্রথম। ভারতের মোট উৎপাদনের প্রায় 42.5% উৎপাদিত হয় এই রাজ্যে। পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিমের শুষ্ক অঞ্চল এবং উত্তরাখন্ডের পাহাড়ি অঞ্চল ব্যতিত উত্তর প্রদেশের প্রায় সর্বত্রই ইক্ষুর চাষ হয়। এই অঞ্চলের পাললিক মৃত্তিকাযুক্ত বিশাল অঞ্চলে সঙ্গে যথাযথ জলবায়ু, জলসেচের সঠিক প্রয়োগ এবং সারের ব্যবহার এই অঞ্চলকে ইক্ষু উৎপাদনে প্রথম স্থানে নিয়ে গেছে। এই রাজ্যের ইক্ষু চাষ প্রধানতঃ উচ্চ গঙ্গা-যমুনা দোয়াব ও রোহিলখন্ড অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। রাজ্যে উৎপাদিত ইক্ষুর প্রায় 70% আসে এই অঞ্চল হতে। উত্তরপ্রদেশের প্রায় 31টি জেলার ইক্ষুর চাষ হয় তবে এদের মধ্যে মিরাট, মোরাদাবাদ, সাহারাণপুর, ফৈজাবাদ, বারাণসী, জোলপুর, আজমগড়, গাজিয়াবাদ, বেরেলি, বুন্দেলশহর এবং সীতাপুর প্রধান ইক্ষু উৎপাদক জেলা।

মহারাষ্ট্র (Maharastra) : ইক্ষু উৎপাদনে উত্তরপ্রদেশের পর মহারাষ্ট্রের স্থান। মহারাষ্ট্র দেশের মোট উৎপাদনের মাত্র 13 % উৎপাদন করে এবং মোট জমির মাত্র 14% জমিতে ইক্ষুর চাষ হয়। এখানকার স্বল্প পরিমাণ জমিতে ইক্ষু চাষ হলেও এখানকার হেক্টর প্রতি উৎপাদন অনেক বেশি। এখানকার লাভাযুক্ত পলিমাটিতে জলসেচের সাহায্যে ইক্ষুর চাষ হয়। এই রাজ্যের প্রধান ইক্ষু উৎপাদক জেলাগুলি হল কোলাপুর, সাতারা, আহমেদনগর, শোলাপুর, সানগ্লি, নাসিক ও সমানাবাদ ও ঔরঙ্গাবাবাদ।

তামিলনাড়ু (Tamilnadu) : তামিলনাড়ু দেশের উৎপাদনের 11% উৎপাদন করে এবং এখানকার চাষ যোগ্য জমির 6% অঞ্চলে ইক্ষুর চাষ হয়। হেক্টর প্রতি উৎপাদন যথেষ্ট বেশি 1067.8 কুইন্টাল/প্রতিহেক্টর)। এখানকার উৎপাদনের 80% আসে উত্তর আরকট, আম্বেদকর, দক্ষিণ আর্কট, ভাল্লালরে, পেরিয়ার, সালেম, তিরুচিরাপল্লী ও কোয়েম্বাটুর হতে। বাকি 20% উৎপাদিত হয় ধরমপুর, মাদুরাই, তাঞ্জাভুর এবং রামনাথ পুরম হতে।

অন্ধ্রপ্রদেশ (Andhra Pradesh) : এই রাজ্যের অধিকাংশ ইক্ষু চাষ হয় সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে। এখানকার উর্বর মৃত্তিকা এবং উপযুক্ত সামুদ্রিক জলবায়ু উৎপাদনে সহায়তা করে। এখানকার পশ্চিম ও পূর্ব গোদাবরী, বিশাখাপট্টনম, কৃষ্ণ, শ্রীকাকুলাম এবং নিজামাবাদ রাজ্য ইক্ষু উৎপাদনে প্রধান।

গুজরাট (Gujrat) : গুজরাটের উৎপাদন মাত্র 4.99% এবং এখানকার উৎপাদন অঞ্চলের পরিমাণও খুব কম (4.65%) কিন্তু এখানকার হেক্টর প্রতি উৎপাদন অধিক বলে এখানকার মোট উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় 10.31%। এখানকার সুরাট, ভবনগর, রাজকোট, জুনাগড় এবং জামনগর ইক্ষু উৎপাদনে প্রসিদ্ধ।

পাঞ্জাব (Punjab) : সবুজ বিপ্লবের ফলে এখানকার গম চাষের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে এবং এর ফলে ইক্ষু চাষের ব্যাঘাত ঘটে। এখানকার প্রধান উৎপাদন অঞ্চলগুলি হয় গুরদাসপুর, জলন্ধর, অমৃতসর, রূপনগর এবং ফিরোজপুর।

হরিয়ানা (Haryana) : বিগত কয়েক বছরে জলসেচের প্রসার এই অঞ্চলে ইক্ষু চাষের বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। এখানকার উর্বর মৃত্তিকাযুক্ত কার্নাল, কইথাল, আম্বালা, কুরুক্ষেত্র, হিসার, পানিপথ, গুরগাঁও এবং ফরিদাবাদে অর্থকরী ফসল হিসেবে ইক্ষুর চাষ হয়। তবে এই রাজ্যের শুষ্ক পশ্চিম অঞ্চলে ইক্ষুর চাষ হয় না।

উত্তরাঞ্চল (Uttaranchal) : উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশই পর্বতময়, ফলে চাষের সুযোগ কম। তবে কিছু কিছু অঞ্চলে আখের চাষ হয়। এর মধ্যে উধমসিংনগর, নৈনীতাল এবং দেরাদুন অঞ্চল পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত বলে এই সকল অঞ্চলে ইক্ষুর চাষ হয়।

বিহার (Bihar) : বিহারের প্রধান ইক্ষু উৎপাদন অঞ্চলটি উত্তরপ্রদেশের ইক্ষু উৎপাদন অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে গমের ফলন বৃদ্ধি ঘটায় ইক্ষু চাষের জমির পরিমাণ কমে গেছে। এখানকার চম্পারণ, গয়া, সারণ, মুজফরপুর, দ্বারভাঙ্গা এবং পাটনায় ইক্ষু চাষ হয়।

এগুলি ব্যতিত অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে উড়িশার কোরাপুট, কটক, পুরী এবং সম্বলপুর, মধ্যপ্রদেশের মেরেনা ও রাতলাম জেলা, অসমের ব্রহ্মপুত্র নদী উপত্যকা, পশ্চিমবাংলার বর্দ্ধমান, বীরভূম, হুগলী, মালদা, উঃ 24 পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, রাজস্থানের গঙ্গানগর, কোটা, চিত্রদুর্গ, ভিলওয়ারা এবং উদয়পুর জেলা ইক্ষু উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ।

ইক্ষু চাষের সমস্যা (Problems of Sugarcane Cultivation) :

ইক্ষু চাষের ক্ষেত্রে ভারতে যে সকল সমস্যাগুলি প্রধান সেগুলি যথাক্রমে—

(1) হেক্টর প্রতি উৎপাদন ভারতে খুব কম। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ বা ডাঙায় যেখানে উৎপাদন হেক্টর প্রতি যথাক্রমে প্রতি যথাক্রমে 255 ও 140 মেট্রিক টন, সেখানে ভারতে মাত্র 75–106 মেট্রিক টন।

(2) ভারতে উৎপন্ন ইক্ষুর রসের পরিমাণ কম হয়।

(3) দক্ষিণ ভারতে ইক্ষু উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণ অপেক্ষা উত্তর ভারতে অধিক ইক্ষুর চাষ হয় (60%)।

(4) ভারতের অধিকাংশ চাষি দরিদ্র ফলে চিনির ক্রয় ক্ষমতা তাদের কম। আবার অধিকাংশ ছিবড়া জ্বালানিরূপে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই ছিবড়া হতে কাগজের বোর্ড তৈরী হলে তা থেকে অধিক মূল্য পাওয়া সম্ভব হয় না। অন্যদিকে আখের গুড় হতে সুরাসার প্রস্তুত করা যায়। এর ব্যবস্থা চাষীদের কাছে নেই বলে তারা প্রকৃত মূল্য হতে বঞ্চিত হয়।

(5) ইক্ষুর ক্ষেত্রে সর্বত্র কোন বাণিজ্য কেন্দ্র নাই ফলে মালিকরা স্বল্প মূল্যে কল মালিকদের নিকট কাঁচামাল বিক্রয় করতে বাধ্যতা।

(6) সেচ ব্যবস্থা সর্বত্র সমান নয় এর সঙ্গে সারের অপ্রতুলতা এবং প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষ ইক্ষু চাষের বিশেষ সমস্যা রূপে দেখা দিয়েছে।